শেখ হাসিনা

দারিদ্র্য দূরীকরণ: কিছু চিন্তাভাবনা

জননেত্রী শেখ হাসিনার নানা ধরনের চিন্তার ফসল এ-গ্রন্থ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ের অনেক চিন্তা তাঁর মনে উঁকি মারে। জনজীবনে যে অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা তা উদ্বিগ্ন করে তোলে তাঁকে। নৈতিকতাবোধ লুপ্ত হয়ে গেছে, মূল্যবোধ চলে গেছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ আর লোভ গ্রাঁস করছে গোটা সমাজকে।

মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা, কর্তব্যবোধ, সহানুভূতি দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে।

এমনই পরিস্থিতি যখন সারা দেশে বিরাজ করছে তখনই এক সাগর ভালবাসা নিয়ে গণমানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন গণতন্ত্রের মানসকন্যা শেখ হাসিনা।

দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছে এদেশের অধিকাংশ মানুষ। অভাবের তাড়নায় তারা বিপদগামী হয়ে ওঠে কখনো কখনো। কেননা তাদের সামনে কোন কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ থাকেনা। কোন স্বপ্ন থাকে না। যদিও এই সব গণমানুষকে বারবার স্বপ্ন দেখানো হয়েছে, সোনালী ভবিষ্যতের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বারবার তারা আশাহত হয়েছে। তাদের আশাহত বুকে, তাদের ভাঙ্গা মনে নতুন করে আশা আর প্রাণের সঞ্চার জাগাতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামে নিজের জীবন যেমন উৎসর্গীত করেছেন তেমনি অন্তরের তাগিদে কলম হাতে তুলে নিয়েছেন।

গ্রন্থভুক্ত লেখাগুলোতে তাঁর সত্যিকারের দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে, মানব প্রেম উঠে এসেছে। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ প্রস্ফুটিত হয়েছে। অসহায়, নিপীড়িত, বঞ্চিত গণমানুষের জন্য তিনি সবকিছু ত্যাগ করে নিরলস প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। এই সব ভাগ্যহত মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নে, সমাজের অবহেলিত মানুষকে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কি ধরনের পদক্ষেপ এবং প্রচেষ্টার প্রয়োজন তার বিশদ বর্ণনা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত করেছেন তিনি এ-গ্রন্থে। গ্রন্থভূক্ত প্রবন্ধের প্রতি ছত্রে ছত্রে তাঁর দরদি মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

শেখ হাসিনার সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধগুলো দেশের সুধীমহল কর্তৃক ইতোপূর্বেই উচ্চ প্রশংসিত। মানুষ ও সমাজের এবং আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উন্নয়নে তাঁর যুক্তি, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং যুগোপযোগী। গ্রন্থভূক্ত প্রবন্ধগুলোতে উপস্থাপিত অর্থনৈতিকদর্শন এ দেশে বাস্তবায়িত ও প্রতিষ্ঠিত হলে দেশ ও দেশের মানুষ সুখ, স্বাচ্ছন্দ আর স্বস্তিতে বাস করতে পারবে এটা বলা যায় নি:সন্দেহে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের মানসকন্যা হিসেবে দেশ ও জনগণের প্রিয় নেত্রী ও এক অনন্য আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা হিসেবে শৈশব থেকেই পিতার রাজনৈতিক জীবনের সান্নিধ্য ও শিক্ষা-দীক্ষা শেখ হাসিনার মেধা-মননকেও পরিপুষ্ট করেছে। ১৯৭৫ পরবর্তীকালে দেশে সামরিক স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের প্রশ্নটি ছিল শাসকগোষ্ঠীর কাছে উপেক্ষিত। রাজনীতিকে দূর্নীতিপরায়ণ করে জনমনে হতাশা সৃষ্টি করাই ছিল শাসকগোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য। এই দুঃশাসনের বিরুদ্ধে 'জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার' আন্দোলনে শেখ হাসিনা এক দুঃসাহসী নেতৃত্ব প্রদান করে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। শেখ হাসিনার প্রধান চারিত্রিক মাধুর্য হল তার মানবিক মূল্যবোধ। তিনি সম্পূর্ণরূপেই একজন রাজনীতিমনস্ক ব্যক্তিত্ব।

একজন আদর্শ বাঙালি নারীর প্রতীক হিসেবে তিনি আজ জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের আন্দোলনেও অঙ্গীকারবদ্ধ। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে দেশে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকারকে হরণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধকেও ভূলুণ্ঠিত করা হয়।

১৯৮১ সালে শেখ হাসিনার রাজনীতিতে নেতৃত্ব গ্রহণ জনগণের কাছে এক নতুন আশা আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়। তিনি নিজেই বলেছেন, 'বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই আমার রাজনীতি।'

দেশ থেকে সামরিক শাসনের অবসান, স্বৈরতন্ত্রের মূলোৎপাটন, সন্ত্রাসের রাজনীতির অবসান এবং অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা হ্রাস করে জনগণকে শোষণের নির্যাতন থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তিনি প্রায় দেড় দশক সময় ধরে নেতৃত্ব প্রদান করে আসছেন। তাঁর এই দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, আপোষহীন নিরলস সংগ্রামী চেতনা জনগণের প্রতি মমত্ববোধ তাঁকে আজ অবিস্মরণীয় নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার আন্দোলনের মমতাময়ী নেত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা এক আলোচ্য ব্যক্তিত্ব।

শেখ হাসিনার এই সাহসী ও দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে তাঁর শ্রম, মেধা, মানবিক মূল্যবোধ এবং জনগণের শুদ্ধতম ভালবাসা।

পঞ্চম মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪০১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪ মে ১৯৯৭
তৃতীয় মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪০৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯
চতুর্থ মুদ্রণ বৈশাখ ১৪১৮ মে ২০১১

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৯৫৯১১৮৫, ৯৫৩৩০৮৩
প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরী
মুদ্রণ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন ঢাকা
মুল্য : ১২৫.০০ টাকা

Some Thoughts On Poverty Alleviation by Sheikh Hasina
Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh.
Phone : + 8802 9591185, 9533083
e-mail : info@agameeprakashani-bd.com

ISBN 978 984 04 1688 2

উৎসর্গ

আমার আদরের ছোট্ট বোনটি
রেহানাকে

ভূমিকা

ছোট ছোট নানা ধরনের চিন্তার ফসল আমার লেখাগুলি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ের দিকে যখন তাকাই তখন অনেক কথা অনেক চিন্তা মনের মাঝে উঁকি মারে। জনজীবনে যে অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা তা উদ্বিগ্ন করে তোলে। মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই। সামাজিক অনাচার, নারী নির্যাতন, হত্যা, ছিনতাই, ডাকাতি প্রতিদিনের ঘটনা। মানুষের মানসিকতা আজ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বন্ধু বন্ধুকে হত্যা করছে, বিবেক দংশন করে কিনা বোঝা যায় না। অতিক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য স্বামী স্ত্রীকে হত্যা করছে। নৈতিকতা বোধ লুপ্ত হয়ে গেছে, মূল্যবোধ চলে গেছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ, লোভ গ্রাস করছে গোটা সমাজকে। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, কর্তব্যবোধ, সহানুভূতি দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে। স্বার্থপরতায় মানুষ অন্ধ হয়ে গেছে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অনাহার, অবিচারের শিকার নিরীহ অসহায় মানুষ। তাদের কথা ভাববার সময় খুব কম মানুষেরই রয়েছে। সবাই ছুটছে, ছুটছে কিসের আশায় কোন মরীচিকার পিছনে? ছুটছে অর্থ, সম্পদ, বিলাসী সামগ্রীর পিছনে। মানুষ কি একবারও ভাবে একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে? মৃত্যু হচ্ছে সব থেকে বড় সত্য। কিন্তু মৃত্যুর পর সবই ফেলে যেতে হবে। ধন-দৌলত, অর্থ-সম্পদ কিছু নিয়ে যেতে পারবে না। তারপরও এই অন্ধের মতো ছোটাছুটি কেন? খুনোখুনি কেন? প্রতারণা কেন?

আমাদের সমাজে এই মুহূর্তে বড় প্রয়োজন দেশপ্রেমিক মানুষের। যিনি বিলাস-ব্যসনে কালাতিপাত করবেন, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যিনি থাকবেন, যিনি দেশ ও জাতিকে দিক নির্দেশনা দেবেন, দেশকে গড়ে তুলবেন তিনি যদি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তাহলে তো সমাজ ও দেশকে কিছুই দিতে পারবে না। আমাদের দেশের মানুষ স্বাভাবজাত ভাবে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানকে অনুসরণ করে কিন্তু সেই জায়গায় যিনি থাকবেন, তিনি যদি ক্ষমতার চেয়ার রক্ষার চিন্তায় শঙ্কিত থাকেন তাহলে দেশ দশের কাজ করবেন কখন। ক্ষমতার মোহ আবিষ্ট করে রাখে সর্বক্ষণ—এই যদি আবস্থা হয় তাহলে ঐ বুভুক্ষু নরনারীর ক্ষুধার অন্ন যোগাবার চেষ্টা কখন চালাবে?

আমাদের বড় প্রয়োজন একজন ত্যাগী, দেশপ্রেমিক দেশসেবক, যিনি প্রয়োজনে মানুষের জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত থাকবেন। শুধু কথামালার ফুলঝুরি ছুটবে না। বাস্তব জীবনে কাজে কর্মে তার প্রমাণ মিলবে।

জানি না কবে এ দেশের মানুষের মুক্তি আসবে। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসরত ৮৬ ভাগ মানুষকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অনাচার, অবিচার থেকে মুক্ত করতে পারব।

আমার লেখা বঞ্চিত মানুষগুলির জন্য, যদি তাদের জন্য কিছু করতে পারি। সমাজের অবহেলিত মানুষকে টেনে তোলার প্রচেষ্টা প্রতিনিয়ত করে যাব। নইলে বিবেক শান্তি পাবে না।

এই বই প্রকাশের সঙ্গে যারা জড়িত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

শেখ হাসিনা
২৮.০১.১৯৯৫

সূচিপত্র

দারিদ্র্য দূরীকরণ : কিছু চিন্তাভাবনা

অফিস থেকে বাসায় ফিরছি। খামারবাড়ির রাস্তার পাশে ফুটপাতের উপর কয়েকটি পরিবার অবস্থান নিয়েছে। ছোট্ট শিশুসহ মহিলা, তরুণ, বৃদ্ধ সবাই আছে। তারপর যে দৃশ্যটির উপর আমার দৃষ্টি থমকে গেল, ব্যথায় মনটা ভরে উঠল, তা হল ঐ ফুটপাতের উপর রাস্তায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে কতকগুলি জীবন্ত মানুষ। জীবন্ত মানুষ বললে বোধ হয় ভুল হবে, বলতে হয় জীবন্ত কঙ্কাল। ড্রাইভারকে গাড়ি ধীরগতিতে চালাতে বললাম। ধীরে গাড়ি চলতে শুরু করতেই আবালবৃদ্ধবনিতা গাড়ি ঘিরে ধরল। ব্যাগে সব সময় খুচরো কিছু টাকা থাকে, কেউ হাত পাতলে যাতে ফিরে না যায়। বিবেকের তাড়নায় এটা করতে হয়। একটা অজানা অপরাধবোধ যেন কাজ করে। এই পৃথিবীতে জন্মেছি আমি, ওরাও জন্মেছে, মানুষ নামে খ্যাত আমরা যারা গাড়িতে চড়ি— ফুটপাতে বসবাসকারী ঐ কঙ্কালসার দেহধারী ওরাও মানুষ কিন্তু বিরাট একটা ব্যবধান। দীর্ঘদিন অনাহারে থেকে অপুষ্টিতে ভুগে আজ ওদের এই দশা। সোমালিয়া ও ইথিওপিয়ার এই দৃশ্য আমরা অহরহ টেলিভিশনে দেখি। নিজের দেশেরও এই একই দৃশ্য। ১৯৯১ সালে যে চরম দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তখন উত্তরবঙ্গে এমনটি দেখেছিলাম। সারি সারি মানুষের এই একই অবস্থা। ছবিতে এদের চেহারা যখন দেখি তখন বরং প্রায় ১০ পাউন্ড ওজন বেশি দেখায়, বাস্তবে সাদা চোখে সরাসরি দেখলে আরও করুণ।

প্রায়ই আমি গ্রামে যাই। সেখানেও একই অবস্থা। কাজ নেই, খাবার নেই। ফসল যা ফলে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আবহাওয়ার উপর। অনুকূল আবহাওয়ায় ফসল ভালো হয়। তবে সেই ভাগ্য কৃষকের জীবনে কদাচিৎ ঘটে। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, লোনা পানি, খরা, ঝড়, বন্যা ইত্যাদি কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই আছে, তার উপর বীজের অতিরিক্ত দাম, অনেক সময় কৃষকদের পক্ষে কেনাই সম্ভব হয় না। খোরাকি কিনবে না বীজ কিনবে। পোকা ও ইঁদুরের উৎপাতও কম নয়। কীটনাশক ঔষধও অগ্নিমূল্য। সারের দামতো আকাশছোঁয়া। মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করলে একশত টাকায় মাসে দশ টাকা সুদ দিতে হয়। ব্যাংকের ঋণে যথেষ্ট জটিলতা থাকে। তার উপর জমি বা বাড়ি যাদের নেই অর্থাৎ ভূমিহীন যারা, তাদেরকে ব্যাংক কোনো মতেই ঋণ দেয় না। যারা পায় তারাও উঠাতে গেলে যা যায় তার অর্ধেকের বেশি পকেটে আসে, বাকি ঘুষ দিতেই শেষ হয়। যেমন কেউ এক হাজার টাকা পেলে হাতে পাবে ৭০০/৮০০ টাকা এরপর আছে এই টাকার চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ। পুরো টাকাটা হাতে পেলেও কিছু কাজ হয়। কিন্তু তা পাবার কোনো উপায় নেই। ফসল জমিতে থাকতেই বিক্রি করে দিতে হয়। উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্যও পায় না। ফলে উৎপাদিত ব্যয় না উঠাতে পারায় তার ঋণ শোধ হয় না। এককভাবে কৃষক বা প্রান্তিক চাষীদের এ অবস্থা মোকাবেলা করা কখনও সম্ভব নয়। ফলে জমিতে কাজ করবার উৎসাহ মানুষ হারাচ্ছে। এভাবেই একদিন নিঃস্ব হয়ে, বাধ্য হয়ে, বাঁচার শেষ আশা বুকে নিয়ে কাজের খোঁজে মানুষ শহরে চলে আসে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে মেয়েদের ভাগ্য হয় আরও বিপর্যস্ত। একদিকে ভিক্ষাবৃত্তি অপরদিকে দেহ ব্যবসা। পেটের দায়ে এই ফুটপথ থেকেই ১৩-১৪ বছরের কিশোরী থেকে শুরু করে মা কোলের সন্তান রেখেও ২০ বা ২৫ টাকার বিনিময়ে নিজিকে বিকিয়ে দিয়ে ক্ষুণ্নিবৃত্তি করছে। স্বামী সন্তানের ক্ষুধার তাড়না মেটাচ্ছে। এই রাস্তার উপর শতছিন্ন বস্ত্র গায়ে কত নারী ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারই পাশে ভোগ বিলাসিতায় অনেকে

অপ্রয়োজনীয়ভাবে অপচয় করে যাচ্ছে। এই বৈষম্যের অবসান কিভাবে হবে সেই প্রশ্নই বার বার মনকে নাড়া দেয়। দারিদ্র্যের অভিশাপে আমাদের মেয়েরা বিদেশে পাচার হয়ে যায়। মাত্র ২০ টাকায় সন্তান বিক্রির খবর পত্রিকায় ছাপা হয়।

সারা দিন পরিশ্রম করলে হাতে একজন দিনমজুর পায় ৩০ টাকা। সন্ধ্যায় এই ৩০ টাকা দিয়ে চাল কিনবে, ঘরে ফিরবে, ভাত রান্না হবে, পরিবারের সকলে একসাথে ভাত খাবে। একটি পরিবারের ৫ জন থেকে ১০ জন পর্যন্ত খাবার লোক। মোটা নিম্নমানের চালের দাম ১০ টাকা কেজি। সারা দিনের উপোসী পেট, ধরে নেই আমরা ৫ জনের পরিবার অন্ততপক্ষে দেড় কেজি চাল রাঁধতেই হবে। ১৫ টাকা চালের দাম বাকি খরচ কিভাবে চলবে। ২৮-৩০ টাকা কেজি ডাল, ৪৪ টাকা কেজি তেল, ৮ টাকা কেজি লবণ, মরিচ ৪০ টাকা কেজি, ১২ টাকা কেজি পিঁয়াজ, মাছ-তরকারি তো তাদের কাছে স্বপ্ন। বরং শাক পাতা পেলেই মনে করে যথেষ্ট। পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এই তো বরাদ্দ। পরের দিন যদি কাজ না পায় তাহলে পুরো পরিবার অনাহারে থাকবে। খাওয়া-পরার এই অনিশ্চিত জীবন। তারপর বিশুদ্ধ পানির অভাব, জীবনের মান এতই নিম্ন থাকে যে, কোনোমতে বেঁচে থাকাটাই হয়ে ওঠে মুখ্য।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দারিদ্র্যের এই প্রকট অবস্থা তো ছিল না। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশেও ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্বে দারিদ্র্যের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫০ ভাগ। আর আজ তা ৭০/৮০ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে এই অধিকাংশ বাস করে। তখন ভূমিহীনের সংখ্যা ছিল ৩৫ ভাগ, বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ৭০ ভাগে। শহরগুলিতে গড়ে উঠেছে অসংখ্য বস্তি, লক্ষ লক্ষ মানুষ বস্তির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে। নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতে অভাব-অনটনের স্পর্শ লাগছে। অপসংস্কৃতির প্রচণ্ডতায়, অবক্ষয়ের ভাঙ্গন ধরেছে সর্বত্র। নৈতিকতাবোধও লোপ পাচ্ছে।

সম্প্রতি International Fund for Agricultural Developments-এর প্রকাশিত একটি জরিপে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শতকরা ৮৬ ভাগ দরিদ্র। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকও স্বীকার করেছে বাংলাদেশে শহরাঞ্চলে শতকরা ৫৩ ভাগ দরিদ্র।

দারিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা এবং সে কারণেই এদেশের জন্য যেকোনো উন্নয়ন-কৌশলের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে দারিদ্র্য দূরীকরণকে চিহ্নিত করতে হবে। কিন্তু লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত হলেই তা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় করণীয়সমূহ সহজেই নির্ধারিত হয়ে যায় না। এমনকি যদিও বা এ ক্ষেত্রে করণীয়সমূহ নির্ধারিত করা যায়, সে সবের বাস্তবায়ন কিভাবে হবে সে সমস্যা তখন প্রবল হয়ে দেখা দেয়। কেন দারিদ্র্য দূরীকরণের মতো জাতীয় অগ্রাধিকারসম্পন্ন বিষয়ে এত বক্তৃতা-বিবৃতি-ঘোষণা সত্ত্বেও খুব সামান্যই অগ্রগতি এক্ষেত্রে অর্জিত হয়েছে, সে প্রশ্ন আজ উঠতেই পারে। সীমিত সম্পদের ভেতরে থেকে আমরা দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য কি কি পদক্ষেপ এখনই নিতে পারি সেটি নির্ধারণ করা আজ নানা কারণে জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রথমত, বিপুল পরিমাণ দারিদ্র্যের বোঝা নিয়ে জাতি হিসেবে আত্ম-সম্মানের সাথে বিশ্ব-সভায় দাঁড়ানো যায় না। দ্বিতীয়ত, চরম দারিদ্র্যের ভেতরে দেশের অধিকাংশ মানুষকে যদি বছরের পর বছর ধরে বাস করতে হয়, তবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে বাধ্য। তৃতীয়ত, আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতা অনেকখানিক নির্ভর করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নতির ওপর। আমাদের সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীই হচ্ছে দরিদ্র, ধনিক গোষ্ঠীর সংখ্যা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কাজেই গণতন্ত্র যদি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্যে অর্থবহ না হয়ে ওঠে কেবল ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করে, তাহলে জনগণের কল্যাণ সাধন হবে না। দেশের অর্থনীতির ভিতও শক্তিশালী হবে না। কাজেই আগামী বছরের জন্য বাজেট প্রস্তুত হওয়ার পূর্বে কিভাবে এই

বৃহৎ জনগোষ্ঠীর অবস্থান উন্নতি করা যায় তার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণীত হওয়া উচিত। দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পভিত্তিক বা সমাজ-কল্যাণমূলক, ছিঁটেফোঁটা অনুদান বা ঋণ বিতরণ বা খয়রাতি সাহায্য হিসেবে কর্মসূচি গ্রহণ করলে চলবে না, জাতীয় উন্নয়ন ও উৎপাদনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্থায়ী ভিত্তিতে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। জনগণের জীবনের মানোন্নয়ন এবং ভাগ্য পরিবর্তনের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তিযুক্ত জীবন-ব্যবস্থার যতখানি সম্ভব সুযোগ-সুবিধা তাদের আয়ত্তের মধ্যে আনতে হবে। গণতন্ত্র যদি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্যে অর্থবহ না হয় তার ভিত্তি দুর্বল থেকে যেতে বাধ্য। আজকের এই লেখাটি সেই তাগিদ থেকেই রচিত।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সে সম্পর্কে কিছু কিছু চিন্তা-ভাবনা ইতোমধ্যেই হয়েছে। সমস্যা হচ্ছে, নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে এসব চিন্তা-ভাবনাকে একত্র করে একটি জাতীয় কর্মসূচির রূপ দিয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণের ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে না। আমি একটি উদাহরণ এ প্রসঙ্গে টানবো। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে গঠিত টাস্ক ফোর্স রিপোর্টে দারিদ্র্য দূরীকরণের বিষয়ে বেশকিছু সুচিন্তিত পরামর্শ রাখা হয়েছিল। সেসব পরামর্শ নিয়ে সরকারিদল-বিরোধীদল সবাই মিলে বিস্তৃত আলোচনা করুক—এ পরামর্শ আমি রেখেছিলাম। দুঃখের বিষয়, টাস্ক ফোর্সের সেসব সুপারিশ শুধু যে বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে প্রতিফলিত হয়নি তাই নয়, এ সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের ন্যূনতম আগ্রহ পর্যন্ত সরকার দেখাননি। বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা অবশ্যই তর্ক-বিতর্ক করবেন। তাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা যারা রাজনীতির সাথে জড়িত, তাদেরকে প্রতিনিয়তই সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয় এবং তাদের সমস্যা ও তার সমাধানের

বিষয়ে তাদের মতামত শুনতে হয়। এই সূত্রেই দারিদ্র্য দূরীকরণের সম্ভাব্য পথ সম্পর্কে আমার মনে যেসব প্রশ্ন জেগেছে তা এখানে উপস্থাপন করতে চাইছি।

দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা তিন ধরনের কর্মসূচির কথা বলেছেন। তারা বলেছেন অর্থনীতির, বিশেষত কৃষি ও শিল্পের প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানোর কথা। তারা বলেছেন মৌলিক সামাজিক সেবাখাত তথা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের সম্প্রসারণের কথা। অর্থাৎ দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাতে করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের সুযোগ পর্যাপ্ত পরিমাণে নিতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়াও চরম দরিদ্র পরিবারের জন্য বিশেষ কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণের উপর তারা জোর দিয়েছেন। এ ধরনের একটি ত্রিমুখী কর্মসূচির সাথে সকলেই মোটামুটিভাবে একমত হবেন বলে আশা করা যায়। দারিদ্র্য যেহেতু বহুমাত্রিক একটি সমস্যা, সেহেতু শুধুমাত্র দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় এবং কর্মসংস্থান বাড়ালেই চলবে না, তার খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষমতাও বৃদ্ধি করতে হবে। বাড়াতে হবে তার অধিকার-সচেতনতা, তার সংগঠন করার ক্ষমতা, স্থানীয় পর্যায়ে স্ব-শাসিত সরকারের (Local Self-government) কার্যক্রমে তার অংশগ্রহণের মাত্রা।

বলা বাহুল্য যে, এসব লক্ষ্য কথার কথা হিসেবে থেকে যাবে যদি কতকগুলি দিক যথাযথ মনোযোগ না পায়। প্রথমত, উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হার নিশ্চয়ই আমাদেরকে অর্জন করতে হবে। কিন্তু শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়, উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য অনেকগুলো বিকল্প পন্থা (কর্মসূচি) হতে পারে। আমাদেরকে সেই কর্মসূচিই বেছে নিতে হবে দারিদ্র্য দূরীকরণের potentials যার সবচাইতে বেশি। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য প্রবৃদ্ধির কোন উপাদানগুলো সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন তা শনাক্ত করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে বলা যায়, প্রবৃদ্ধির যেসব উপাদান গ্রামীণ অর্থনীতি এবং (শহর-গ্রাম নির্বিশেষে) দরিদ্র ক্ষুদে উৎপাদকদের উপর শুভ প্রভাব রাখতে সক্ষম, আমাদেরকে সেসব উপাদানের উপরই প্রাথমিকভাবে জোর দিতে হবে।

এই সূত্রে প্রথমেই আসে সেচ-ব্যবস্থা, গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন, শহর ও গ্রামের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের প্রয়োজনীয়তা। গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামোর সম্প্রসারণও এ ক্ষেত্রে হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবে লক্ষ রাখা দরকার, যোগাযোগ অব-কাঠামোর বিকাশ যাতে করে পরিবেশ-বিধ্বংসী হয়ে না দাঁড়ায়। এসব কর্মসূচির উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ ঘটলে কৃষি ও অকৃষি খাতে নিয়োজিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় ও কর্মসংস্থান বাড়বে। অবশ্যই, দীর্ঘমেয়াদি বিচারে শিল্পায়ন ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। ক্রমবর্ধমান গ্রামীণ জনশক্তিকে শুধুমাত্র কৃষি খাতে নিয়োজিত করা সম্ভব নয়, এর জন্য শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন। কিন্তু এখানেও অনেকগুলো বিকল্প পন্থা (কর্মসূচি) হতে পারে। আমাদেরকে শিল্পায়নের সেই পন্থাই বেছে নিতে হবে যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধিতে অধিকতর সহায়ক হবে। শ্রমঘন রপ্তানিমুখী শিল্পের সর্বাত্মক বিকাশ আমরা দেখতে চাই, কেননা এসব শিল্পের বিকাশ ঘটলে অধিক হারে কারখানা-শিল্পে দরিদ্রদের কর্মসংস্থান ঘটবে (যেমনটা ঘটেছে তৈরি পোশাক শিল্পে), তবে বিকাশের যে স্তরে আমরা এখনো অবস্থান করছি, সেখানে প্রাথমিকভাবে কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পকে সর্বাগ্রে গতিশীল করে তুলতে হবে, যেখানে ক্ষুদ্র উৎপাদকদের ভূমিকা হতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এদের জন্য বর্তমানে সামান্যই করা হচ্ছে। শহর ও গ্রামের ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য উপযোগী ঋণ, প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, বিপণন নীতিমালা প্রণীত হয়নি। গ্রামের প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিরা সরকারি, বেসরকারি, এনজিও কোনো উৎস থেকেই সহায়তা পায় না। এখনো পর্যন্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের জন্য একটি পৃথক ব্যাংক এ দেশে গড়ে ওঠেনি। প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের সমস্যা বাদ দিলেও সাধারণভাবে দেখা যায় যে, কৃষি খাত অবহেলার শিকার হচ্ছে। সহনীয় মূল্যে কৃষি উপকরণের সরবরাহ, ঋণ সুবিধার সম্প্রসারণ, কৃষিপণ্যের জন্য ন্যূনতম মূল্য—সমর্থন করা হচ্ছে না। এর ফলে সেচ ব্যবস্থার ও সে সূত্রে উচ্চফলনশীল ধানের আবাদ আশানুরূপ হারে সম্প্রসারিত হচ্ছে না।

উন্নত দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা আর অনুন্নত দেশের নীতিমালা ঠিক একই রকম হতে পারে না। অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালা এমন হওয়া উচিত যাতে সেই দেশ উন্নত দেশে উন্নীত হতে পারে। একবার উন্নতি করতে পারলে তবেই একই ধরনের নীতিমালা করা যেতে পারে। কৃষি খাতে ভর্তুকি দেবার প্রশ্ন রয়েছে—ভর্তুকি ছাড়া যদি কৃষকরা চলতে পারত আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হতাম এবং কৃষি উপকরণে ভর্তুকি না দেবার পক্ষেই মত দিতাম। তবে, আমাদের দেখতে হবে এতে প্রবৃদ্ধি অর্জন বৃদ্ধি পাবে কিনা। বাস্তব অবস্থা হল, আমাদের গ্রামীণ আর্থিক অবস্থার এমনই দৈন্যদশা যে সে সম্ভবনা নেই, কাজেই যতদিন পর্যন্ত চাহিদা অনুযায়ী প্রবৃদ্ধি অর্জন না হয় ততদিন পর্যন্ত কৃষি উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির প্রয়োজনে কৃষি উপকরণের ওপর ভর্তুকি দিতে হবে। শহরের রুগ্ন শিল্পসমূহের বড় পুঁজির মালিকেরা, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের বড় বড় কর্পোরেশনগুলি যদি ভর্তুকি পেতে পারে, তাহলে গ্রামের দরিদ্র চাষিরা ভর্তুকি পাবে না কেন? প্রতিটি উৎপাদনশীল খাতকে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। কিন্তু যদি কোনো বিশেষ কারণে সাময়িকভাবে কোনো খাতকে ভর্তুকি দিতে হয়, তাহলে সেটা যাতে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উপকৃত করে তা নিশ্চিত করতে হবে। অর্থনৈতিকভাবে সে খাত যেন উৎপাদনশীল হয় তাও নিশ্চিত করতে হবে। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে কৃষি উপকরণের সরবরাহ, কৃষিঋণ ও কৃষিপণ্যের ন্যূনতম মূল্য সমর্থনকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

আমি শুনে চিন্তিত যে সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এখন অনেক জায়গায় তাদের শাখা গুটিয়ে নিচ্ছে, বেসরকারি ব্যাংকগুলো কৃষিতে ঋণ সরবরাহে মোটেও আগ্রহী হচ্ছে না, সেচ ব্যবস্থায় সরকারি বিনিয়োগ আশানুরূপ হারে বাড়ছে না। এর ফলে কৃষির প্রবৃদ্ধির হার যতটা বাড়ানো যেত তার সামান্যই অর্জিত হয়েছে। বলাবাহুল্য যে, ভালো আবহাওয়ার কারণে (আমন) ফসল ভালো হলে তার জন্য

সরকারি কৃষিনীতিকে বাহবা দেওয়া, আবার ফসল খারাপ হলে তার দায়-দায়িত্ব প্রাকৃতিক দুর্যোগের ওপর চালিয়ে দেওয়া—এ ধরনের প্রবণতা কৃষির প্রকৃত সমস্যাকে বুঝতে সাহায্য করে না।

দ্বিতীয়ত, দারিদ্র্য দূরীকরণ কার্যক্রমকে যদি বাস্তবিকই শক্তিশালী করতে হয়, সরকারি ব্যয়-বরাদ্দের কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস ছাড়া তা সম্ভব নয়। অবশ্য কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের আগে প্রয়োজন হল পরিচ্ছন্ন তথ্যের। অর্থমন্ত্রীকে যদি আমি প্রশ্ন করি, গেল বছরে বা ঐ বছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে সব খাত মিলিয়ে সরকারি ব্যয়ের কত শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নিচের মানুষের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে-তাঁর কাছে কি এ প্রামাণ্য উত্তর পাওয়া যাবে? আমাদের জানতে হবে—প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিরা সরকারি কৃষি ঋণের মোট কতটা পাচ্ছে, ভূমিহীনদের বিশেষ কর্মসংস্থান কর্মসূচিকে কতটা গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে, শিল্পখাতে মোট বরাদ্দের কতটুকু যাচ্ছে গ্রাম ও শহরের ক্ষুদে উৎপাদকদের পেছনে। একইভাবে, স্বাস্থ্য খাতে কত বরাদ্দ হয়েছে সেটুকু জানানোটাই যথেষ্ট নয়।। স্বাস্থ্য খাতের ভেতরে গ্রামীণ স্বাস্থ্য খাতে কতটা গেল, এবং তার ভেতরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা খাত কতটা পেল সেটা আলাদা করে জানতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমার প্রস্তাব এই যে, আগামী বছরের প্রস্তাবিত উন্নয়ন-বাজেটের প্রতি খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের কত শতাংশ দরিদ্র উৎপাদক তথা দারিদ্র্য সীমার নিচের ৬০-৭০ শতাংশ মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা তুলে ধরা হোক। এই তথ্য স্পষ্ট করে জানতে পারলে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দের কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের আলোচনাটিও তখন অর্থবহ হবে।

তৃতীয়ত, গত এক দশকে দারিদ্র্য দূরীকরণের ওপর শুভ প্রভাব বিস্তারের সক্ষম এমন কিছু খাতে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে বলে দাবি করা হয়ে থাকে, সেখানেও বিভিন্ন অমীমাংসিত ক্ষেত্র রয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে গ্রামে নিরাপদ পানীয় জলের সুযোগ বৃদ্ধি, বিদ্যালয়গামী ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা হার বৃদ্ধি, টিকাদান কর্মসূচি সম্প্রসারণ, এনজিও

কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ইত্যাদি উল্লিখিত হয়ে থাকে। প্রথমেই বলা দরকার যে, এসব সূচকের ওপর সরকারি পরিসংখ্যানের যথার্থতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। যদি মেনে নিই যে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে অন্ততপক্ষে পরিবর্তনের প্রবণতা কিছুটা হলেও ধরা পড়েছে তাহলেও বেশ কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। যেমন গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়গামী ছাত্র-ছাত্রীর হার নাকি ৬০-৬৫ শতাংশ পৌঁছেছে। কিন্তু এই সংখ্যা বৃদ্ধির তথ্যের পাশাপাশি এও আমাদের জানতে হবে যে, এদের মধ্যে কতজন প্রতি বছর বিদ্যালয়ে থেকে ঝরে পড়ছে। টিকাদান কর্মসূচির সম্প্রসারণের মাত্রা ৮০ শতাংশ বলে দাবি করা হচ্ছে। জানতে ইচ্ছে হয় ইমিউনাইজেশনের ৬টি টিকাই কি বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ পরিবারের শিশুদের দেয়া হয়েছে? এ কথা তো কোনোভাবেই বিশ্বাস করা যায় না। গ্রামে নিরাপদ পানীয় জলের সুযোগ বৃদ্ধি ঘটেছে বলেই গ্রামীণ স্বাস্থ্য নিয়ে দুর্ভাবনার কারণ কমে যাবে না। নইলে প্রায়ই গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় ডায়রিয়ার প্রকোপ দেখা দিচ্ছে কেন? অথবা শিশুমৃত্যুর হার কমার ক্ষেত্রে কেন লক্ষণীয় কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না? শিশুমৃত্যু ডায়রিয়া ইত্যাদির পিছনে মূল কারণ হচ্ছে পুষ্টিহীনতা। একজন মানুষের শরীরের প্রয়োজনীয় ক্যালরিযুক্ত খাদ্য গ্রহণের অভাব ১৯৭৫ সালে তা গ্রহণের গড়পড়তা পরিমাণ ছিল ৮০৭ গ্রাম, ১৯৮১ সালে তা হ্রাস পেয়ে ৭৬৪ গ্রাম এবং ১৯৯১ সালে তা আরও কমে গিয়ে গড়পড়তা ৬৯২ গ্রামে দাঁড়িয়েছে। ভোগের হিসেবে ১৯৭৫ সালে ক্যারলি গ্রহণের গড়পড়তা পরিমাণ ছিল ২০৯৪, ১৯৮১ সালে ১৯৪৩ এবং ১৯৯১ সালে হ্রাসকৃত পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮৪০ ক্যালরিতে।

অর্থনৈতিক অবস্থান বিশ্লেষণ করলে বর্তমান বাংলাদেশে শতকরা ৮৭ ভাগ মানুষ প্রয়োজনীয় ক্যালরি গ্রহণ থেকে বঞ্চিত। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯৫ ভাগ পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এর মধ্যে শিশু ও মায়েরাই বেশি আক্রান্ত। পুষ্টির অভাবে শিশু বিকলাঙ্গ, অন্ধত্ব ও পঙ্গুত্ব বরণ করছে। এমন কি এর ফলে শিশুমৃত্যুর হার শতকরা ১৬ ভাগেরও

ঊর্ধ্বে। ক্ষুধার্ত মানুষ দীর্ঘদিন অভুক্ত অনাহারে থাকলে শরীর দুর্বল হয়। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য কচু, ঘেচু, শাকপাতা যা পায় তাই খায়, ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে, এই মৃত্যুর সঠিক পরিসংখ্যানও নেওয়া হয় না। আমাদের দেশে এখনও কত শিশু জন্মায় তার কোনো তালিকা সরকারের দপ্তরে জমা হয় না বা রেজিস্ট্রেশন হয় না, সার্টিফিকেটও সরবরাহ করা হয় না—যেমন বিদেশে হয়, আবার কত শিশু বা কত মানুষের মৃত্যু হয় তারও কোনো হিসাব থাকে না বা রেজিস্ট্রার করা হয় না, সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় না। শিশুরা শুধুমাত্র টিকাদান করলেই যে রোগের হাত থেকে বাঁচবে তা নয়—সুস্থ-স্বাস্থ্যের অধিকারী হবার জন্য যে পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন তা নিশ্চিত করতে হবে। সেটা করতে পারলেই টিকাদানের সুফল পাওয়া যাবে।

গ্রামে নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার নিদারুণ অভাব এই সমস্যাকে জরুরি ভিত্তিতে আজ মোকাবেলা করার চেষ্টা নেওয়া হয়নি। এর জন্যে চাই প্রয়োজনীয় সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ এবং সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম। গ্রামীণ প্রাথমিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার পরিস্থিতিও শোচনীয় পর্যায়ে। হেলথ কমপ্লেক্স নির্মাণ করবার পরিকল্পনা স্বাধীনতার পর পরই নেওয়া হয়েছে কিন্তু আজও তা সমাপ্ত হয় নাই, কাজেই স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ বাড়েনি। সরকারি হাসপাতালে মাত্র ১০ ভাগ রোগী চিকিৎসার সুযোগ পায়। এ অবস্থার অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। তাছাড়া মনে রাখা প্রয়োজন যে, সব সময় সংখ্যাগত বিচারে প্রকৃত অগ্রগতির ধারা বোঝা যায় না।

প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহণ যাতে বাড়ে তার ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে। প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেই যথেষ্ট নয়, শিক্ষার নামে কি ধরনের শিক্ষাদান চলছে, শিক্ষকদের মান, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, বছরে

সর্বমোট কত ঘণ্টা স্কুলে পড়ানো হচ্ছে—এসব বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে। এক কথায় বলতে গেলে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের মতো দুটি মানবিক গুরুত্বসম্পন্ন খাতের আলোচনায় বেশি করে গুণগত দিকের ওপর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। একই কথা খাটে এনজিও কর্মকাণ্ডের খতিয়ান নেওয়ার প্রসঙ্গেও। গত এক দশকে ঐসব কর্মকাণ্ডের তাৎপর্যপূর্ণ বিস্তৃতি ঘটেছে এমনটা বলা হয়ে থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে এনজিও কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটল দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে এর সামগ্রিক সাফল্য কতটুকু? সরকারি-এনজিও খাত মিলিয়ে প্রতি বছর Targetted Programmes-এর নামে যতটা তহবিল বৈদেশিক সাহায্য বাবদ আসে, তার কত শতাংশ গরিবদেরকে ঋণ প্রদানের কাজে বরাদ্দ করা হচ্ছে বা যারা ঋণ পেল তাদের কত শতাংশ দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠতে পেরেছে শেষাবধি-এসব প্রশ্ন থেকেই যায়।

চতুর্থত, দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য যে ধরনের কর্মসূচিই হাতে নেওয়া হোক না কেন, তার বাস্তবায়নের পথে সবচাইতে বড় বাঁধা দুটো : এক. রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, দুই. আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। আমি এখানে দ্বিতীয় বিষয়টির ওপর মনোযোগ দেব। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ঔপনিবেশিক আমল থেকে গড়ে ওঠা আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের বড় ধরনের কোনো সংস্কার করা হয়নি। রাষ্ট্রযন্ত্রের দমন-নির্যাতনমূলক, নিয়ন্ত্রণমূলক প্রভৃতি দিকগুলি তার উন্নয়নমূলক চরিত্র (বস্তুত এর 'উন্নয়ন-বিরোধী' কার্য পরিচালনা বিধি) অক্ষুণ্ন রেখে সরকারি-বেসরকারি কোনো উদ্যোগেরই সফল বাস্তবায়ন সম্ভব নয়; সম্ভব নয় প্রবৃদ্ধির স্বার্থে রপ্তানিমূলক শিল্পের বিকাশ, বৈদেশিক বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা, অথবা গ্রাম ও শহরের কৃষি ও শিল্পের ক্ষুদ্র উৎপাদকদের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দান।

দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য যে ধরনের উন্নয়ন-চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা দরকার, তার সামর্থ্য বা সদিচ্ছা কোনোটাই এই আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের নেই। এ লক্ষ্যে আমি একটি ত্রি-মুখী সংস্কার প্রস্তাব আনতে চাই : (১) যেসব রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন, বিধিমালা উৎপাদন খাতে জনগণের স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগকে ব্যাহত করছে, সেসব অবিলম্বে শনাক্ত করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে তার সংস্কার করতে হবে (২) বর্তমানে কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্র যেভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে, তার উন্নয়ন উপযোগিতা তলিয়ে দেখতে হবে ; (৩) আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নয়, একমাত্র বিকেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই দারিদ্র্য দূরীকরণের কর্মসূচি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন ও তাতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে। এবং এটা করার জন্য দক্ষ প্রতিনিধিত্বশীল একটি স্থানীয় সরকার-কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

শেষোক্ত প্রসঙ্গটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ইতোপূর্বে 'স্থানীয় সরকার' গড়ার প্রচেষ্টা বিভিন্ন সময়ে দেখা গেলেও কার্যত তা কেন্দ্রীয় সরকারের সম্প্রসারিত শাখায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় সরকারকে সরকারি দলের রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া যেমন একটি দিক, স্থানীয় সংগঠনের প্রতিনিধিদের অধিকার সম্প্রসারণও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমি এখানে যে স্থানীয় সরকারের কথা বলছি তা হবে স্থানীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি। এ জন্য চাই স্থানীয় সরকার কাঠামোর প্রতিনিধিত্বশীলতা ও জনগণের সাথে সম্পৃক্তি, কেন্দ্রীয় সরকার ও আমলাতন্ত্রের প্রভাববলয়ের বাইরে এর স্ব-অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা এবং স্থানীয় পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে স্বাবলম্বিতা অর্জনের নিশ্চয়তা। স্থানীয় সরকার কাঠামোর কর্মকাণ্ড আরও দক্ষভাবে পরিচালিত হবে যদি গ্রাম পর্যায়ে সকল গ্রামবাসীদেরকে নিয়ে উন্মুক্ত গ্রাম-সভা প্রভৃতি নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে দরিদ্রদের কার্যকর অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি

পায়। সমাজের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীকে সংহত করার প্রয়োজনীয়তা আজ সবাই স্বীকার করেন। তাদের সংঘবদ্ধ না করে উদ্বুদ্ধ করা কঠিন। কিন্তু সমাজের দরিদ্রতম মানুষ কারা? এ প্রসঙ্গে আমরা শুধু ভূমিহীন কৃষক বা শহরে ও গ্রামে বেকার যুবকদের কথাই ভাবি। আমাদের ভাবতে হবে প্রতিবন্ধীদের কথা। ভিক্ষাবৃদ্ধি ছাড়া তাদের কি কোনো উপায় নেই? আমাদের ভাবতে হবে সেইসব অসংখ্য পরিবারের কথা যেখানে মেয়েরাই পরিবার প্রধান হিসাবে সন্তানদের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা নারীরা যেখানে সন্তান-সন্ততি নিয়ে জীবিকা অর্জনের কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত, সমাজ ও রাষ্ট্র কি তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াবে না? এসব পরিবারের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও বিশেষজ্ঞরা দারিদ্র্য বিমোচনের বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। অতি সত্বরই আমরা এই বিষয়ে একাধিক সেমিনারের ব্যবস্থা করব। আমি মনে করি এই জটিল ও কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্য সুচিন্তিত কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করে তা বাস্তবায়িত করতে হবে।

সবশেষে আমি একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে চাই যা নিয়ে সচরাচর কোনো আলোচনা দেখতে পাওয়া যায় না। আমাদের জীবনের সকল সমস্যা, সমাজের সবকিছুর চাহিদা পূরণের জন্য আমরা বোধ হয় অতিমাত্রায় রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। এই ধারা ব্রিটিশ আমল থেকেই চলে আসছে। বিদ্যাদান থেকে জলদান, স্বাস্থ্যব্যবস্থা থেকে সড়ক নির্মাণ, আইন-শৃঙ্খলা থেকে সংস্কৃতি-চর্চা সবকিছুর জন্যই আমরা হাত বাড়িয়ে অনুদান চাইছি রাষ্ট্রের কাছে। যেন রাষ্ট্রের দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন আমাদের করণীয় কিছু নেই বা তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা নেই। এই চরম রাষ্ট্র-নির্ভরতা ভেতরে ভেতরে সমাজের নিজস্ব উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতাকে অবশ করে দিচ্ছে। যে কাজ সমাজের করার কথা তা রাষ্ট্র নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছে। অতীতে আমাদের গ্রামগুলি

আত্মনির্ভরশীল ছিল। কোনো গ্রামে কোনো দ্রব্যের ঘাটতি থাকলে পাশের গ্রাম থেকে বিনিয়োগের মাধ্যমে তা পূরণ করে নিত। রাষ্ট্রই যে সব সমস্যা সমাধান দেবে তা আশা করত না কিন্তু ব্রিটিশ আমল থেকে ক্ষমতার প্রয়োগ বিস্তার করবার প্রবণতা গোটা সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে শুরু করে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গ্রামীণ স্থিতিশীলতার চিড় ধরায়। সবকিছু ওলটপালট করে দেয়। এই অবস্থা আরও জটিল হয় দেশে সামরিক শাসকদের আমলে। সামরিক শাসকবর্গ ক্ষমতায় এসে উন্নয়নের নামে তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও ক্ষমতার প্রভাব বিস্তার করবার উদ্দেশ্যে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ শুরু করে। উন্নয়নের নামে শোষণ ও রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করা হয়। শোষণের এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন মুক্তির সংগ্রাম চালিয়ে আমরা ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জন করি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত হত্যা, লুট, অগ্নিসংযোগ, নারীধর্ষণ ও নির্যাতন চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। সমস্ত গ্রামীণ সমাজ আর একবার বড় ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

যুদ্ধ পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকার এই গ্রামীণ সমাজের পুনর্বিন্যাসের চিন্তা-ভাবনা শুরু করে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন কিন্তু তা বাস্তবায়ন করবার সময় পাননি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যার মধ্য দিয়ে জনগণের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে সামরিক স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। পুনরায় শুরু হয় দখলিকৃত ক্ষমতার প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা, যা উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। সামরিক শাসকবর্গ দ্রুত রাজনৈতিক নেতৃত্ব হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার মানসে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করবার বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন করে, যার অশুভ ফল হচ্ছে সব সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি। বর্তমানে সমাজ নিয়ন্ত্রণের এই প্রবণতা

বিদ্যমান—যে কাজ সমাজের করবার কথা তার দায়দায়িত্ব রাষ্ট্রই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করছে, ক্ষমতাসীনদের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করবার তাগিদে। প্রশাসনকে জনগণের সেবক না করে সরকারি দলের সেবকে পরিণত করেছে, বর্তমানেও এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

এভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ক্রমেই আরও শক্তিশালী এবং সমাজের বুকের ওপর রাষ্ট্রযন্ত্রের চেপে বসা বোঝাকে ক্রমেই আরও দুর্বহ করে তোলা হয়েছে। যদি আত্মশক্তিতে নিজেদের যা করণীয় এবং নিজেদের যা সামর্থ্যের ভেতরে, তা-ই সম্পন্ন করতে আমরা সক্ষম না হই, তাহলে জাতি হিসেবে বিশ্বসভায় মাথা তুলে দাঁড়াবার কোনো সম্ভাবনাই একদিন আমাদের থাকবে না। রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করবার এই মানসিকতা বজায় থাকলে দারিদ্র্য দূরীকরণের মতো একটি প্রধান জাতীয় সমস্যার সমাধান কখনোই হবে না। খাদ্য, বাসস্থান, প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, দুর্যোগ মোকাবেলা, অবকাঠামো নির্মাণ, সুস্থ সংস্কৃতি-চর্চার বিকাশ ও সবকিছুর অর্জনে প্রথমে সমাজকেই নিজস্ব উদ্যোগ ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় রাখতে হবে। তাতে রাষ্ট্রীয় সহায়তা এলে খুবই ভালো, না এলেও আত্মশক্তিতেই কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এ লক্ষ্যে দেশ নিয়ে যারা ভাবেন সেসব রাজনৈতিক দল, সামাজিক শক্তি ও ব্যক্তিবর্গের প্রতি আমার আবেদন, 'সমাজের কাজ সমাজেরই করা দরকার' এই ঐতিহ্যগত ভাবনাকে আমাদের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে আসুন আমরা ফিরিয়ে আনি। এতে করে এদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণই শুধু ত্বরান্বিত হবে তা-ই নয়, রাষ্ট্র ও সমাজের গণতন্ত্রায়ণও গভীরতর তাৎপর্য লাভ করতে সক্ষম হবে।

১৭ মে, ১৯৯৩

সবার উপর মানুষ সত্য

১

সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানব সন্তান। এই মানব সন্তানের অবস্থান সমাজের সর্বত্রই একই আসনে নেই। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান, আবার একই দেশে কেউ উঁচু স্তরে, কেউ নিচু স্তরে, কেউ মধ্যস্তরে। কোনো কোনো ব্যক্তি সম্পদের প্রাচুর্য, অপচয় ও বিলাসে গা ভাসাচ্ছে, আবার তারই পাশে ক্ষুধার্ত কঙ্কালসার দেহের হা-অন্ন, হা-অন্ন রব উঠছে। কোথাও সামাজিক শক্তির অপব্যবহারে নিষ্পেষিত, অত্যাচার-অন্যায়ের শিকার মানব অধিকার আজ লজ্ঘিত হচ্ছে পদে পদে। সবলের হাতে দুর্বলের নিষ্পেষণ, নির্যাতন। মুক্তি কোথায়?

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক মানবাধিকার সংরক্ষণের ঐতিহাসিক ঘোষণা বিশ্বের মানব জাতির জন্য একটি মাইল ফলক। কারণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে দাসত্ব প্রথা যা হাজার বছর ধরে প্রচলিত ছিল, তা পৃথিবীর বুক থেকে শেষ হয়েছে মাত্র কিছুদিন পূর্বে।

শ্রমিকরা দিন রাত অমানবিক পরিশ্রমের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে জীবনকে নতুনভাবে গড়বার সুযোগ পেয়েছে। অন্তত পরিশ্রমের একটা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত হয়েছে। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। শ্রমিকদের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রেখে অমানবিক পরিশ্রম করবার

যে নিষ্ঠুর কাহিনী আমরা শুনেছি অন্তত সেই পরিবেশ থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ তারা পেয়েছে।

এই ঐতিহাসিক ঘোষণার পর ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বারা শাসিত ও শোষিত বহু জাতি মুক্তি পেয়েছে, অনেক দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং এখনও এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

ঐতিহাসিক মানবাধিকার রক্ষার প্রথম ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল, "All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood." আমার প্রশ্ন, মানব সমাজ কি এই মৌলিক ওয়াদা রক্ষা করতে পেরেছে? বিশ্বে এখনও মানুষে মানুষে বৈষম্য চলছে। নারী সমাজ তাদের সম-অধিকার থেকে বঞ্চিত। বঞ্চিত, শোষিত, দরিদ্র মানব সন্তান মৌলিক চাহিদার ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুও মেটাতে পারছে না। অসহায় শিশুরা তাদের কচি মনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশার আলো জ্বালাতে সক্ষম হয় নাই। দিকহারা, দ্বিধাগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্ত বেকার যুবসমাজ হিরোইন, ড্রাগ, মদ, জুয়া, ভায়োলেন্স ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জীবনের অর্থ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস কেড়ে নিচ্ছে অনেক দেশদরদি নেতাকে, যারা সমাজকে নতুনভাবে গড়তে চেয়েছিলেন, মানবাধিকার রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। মানব অধিকার লঙ্ঘন হবার ঘটনা পদে পদে আমরা অনুভব করছি।

২

যদিও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে নিগৃহীত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু তার মধ্যেও যেটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় তাহলো, নারী ও শিশুরাই সব থেকে বেশি অবহেলিত। যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সামাজিক অনাচারে তারাই হয় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। আমাদের দেশে আত্মসচেতনতার অভাব রয়েছে। আমাদের দেশের মানুষ

ধর্মভীরু, তাই ধর্মীয় অনুশাসন ক্ষেত্র যথেষ্ট বিস্তৃত। নারী সমাজকে মূল ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না। পূর্ণাঙ্গ ধর্মশিক্ষাও দেওয়া হয় না। বরং ধর্মকে রাষ্ট্রীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হয়। নারী সমাজকে দাবিয়ে রাখার জন্য অপব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। নারী সমাজ সমাজের অর্ধেকের বেশি—একটা বিরাট শক্তি। কিন্তু এই শক্তি সমাজের কাজে লাগছে না। এই শক্তির সেবা থেকে দেশ ও সমাজকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। নারীদের মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। নারী সমাজকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। এই শক্তি কাজে লাগিয়ে সমাজসেবার সুযোগ করে দিতে হবে। তার মেধা ও শ্রমশক্তিকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করতে হবে। আর তা করতে হলে সমাজ সম্পর্কে তার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। নারী সমাজকে শিক্ষিত করবার পথ সুগম করা ছাড়া এই সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে নারীর প্রতি মর্যাদাবোধও সৃষ্টি করতে হবে। সমাজে তার অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে হবে। তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

আমাদের দেশ অনুন্নত। আমাদের দেশে শিক্ষার হার ২০-২১ ভাগের বেশি নয়। নারীশিক্ষার হার ১০ ভাগেরও কম। তারা অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাদের সেবা থেকে সমাজ বঞ্চিত। একটি শিশু যখন জন্ম নেয় তখন ধরে নিতে হয় এই শিশু দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক, সমাজের সেবক। তাকে সেইভাবে গড়ে তুলতে হবে। মা যদি শিক্ষিত হন, তবে কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষা নয়, মায়ের কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা সেই শিশুটি পাবে যা তার চরিত্র গঠনে সহায়ক হবে। ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসাবে তাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। আমাদের মতো গরিব দেশে একজনের উপার্জনের উপর পরিবার নির্ভরশীল। স্ত্রী যদি শিক্ষিত হয়ে সংসারের হাল ধরতে পারে, কিছু উপার্জন করতে পারে; তাহলে সংসারে সচ্ছলতা আসতে পারে।

যে মহিলা নিজে উপার্জনে সক্ষম তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, চরিত্রে দৃঢ়তা বাড়ে, সাহসী হয়। সমাজসচেতনতা বাড়ে। সামাজিক

মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তারা নিজের সন্তানদেরও দৃঢ়চরিত্রের গুণাবলির বিকাশ সাধনে সচেষ্টা হতে পারে। এতে প্রত্যক্ষভাবে পরিবারের অবস্থার উন্নতি হবে, পরিবারের সাথে সাথে সমাজ অগ্রগামী হবে এবং রাষ্ট্র সব থেকে বেশি লাভবান হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কেও সচেতনতা তখন তার বৃদ্ধি পাবে।

৩

ঠান্ডাযুদ্ধ শেষ হবার পর বিশ্বে একটা পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনের ঢেউ বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে এসে সমাজের উপর প্রভাব ফেলেছে। যেমন, আমরা কিছুদিন আগে সংবাদ মাধ্যমে দেখলাম রাশিয়ায় মেয়েরা পণ্যের মতো বিক্রি হচ্ছে, অবাধে পতিতালয় সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে নারী পণ্য হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। সমাজের অগ্রযাত্রা না সমাজের অধঃপতন কী হিসেবে এটাকে আখ্যায়িত করা হবে! যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল তখন তো সে দেশে এ অবস্থা ছিল না।

আজ যুগোস্লাভিয়ার পতনের পর বসনিয়া হার্জেগোভিনায় যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে তার চিত্র ভয়াবহ। মুসলিম নারীদের যেভাবে ধর্ষণ করা হচ্ছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এমনিতে আমাদের দেশে "ইসলাম গেল" "বিসমিল্লাহ থাকবে না" নানা ধরনের ধর্ম অনুরাগের বক্তৃতা-বিবৃতি আমরা শুনি এবং বিশেষ করে নির্বাচনের পূর্বে। যাদের ইসলাম রক্ষার নামে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে জন্য কান ঝালাপালা করে, তাদের কাছ থেকেও কার্যকর কোনো প্রতিবাদ বা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আমরা দেখি না। সেখানে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে, নারী-পুরুষ শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে। ঘর-বাড়ি পোড়ানো ও লুণ্ঠন করা হচ্ছে। সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে। এটা কী ধরনের বর্বরতা।

আমরা ব্যথিত হই, আতঙ্কগ্রস্ত হই, কারণ ১৯৭১ সালের পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতনের সেই বিভীষিকাময় দৃশ্য আজও যেন চোখের সামনে ভাসে। শিশুকে হত্যা করে সঙ্গীনের খোঁচায় মাথার ভিতরে পাকিস্তানি পতাকা গেঁথে দেওয়া, অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যা, সম্পদ ধ্বংস, বস্তি পোড়ানো, গ্রাম পোড়ানো, ফসল বিনষ্ট, মা-বোনদের ধর্ষণ করা, স্বামীকে বেঁধে চোখের সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ, পিতার সামনে কন্যাকে, ভাইয়ের সামনে বোনের সম্ভ্রম নষ্ট করবার দৃশ্য বাংলাদেশের মানুষ কখনও ভুলতে পারে না। মধ্যরাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে আজও শোনা যায় আর্তচিৎকার। আজও গুমরে গুমরে কত কান্না বাংলার আকাশ ভারি করছে।

স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে ধ্বংস করবার জন্য, মানুষ হয়েও মানুষকে হত্যা করবার, ধ্বংস করবার, এই রণকৌশল কাকে লাভবান করছে? এত অস্ত্র এত গোলাবারুদের পিছনে অর্থ খরচ হচ্ছে। সৃষ্টিকে ধ্বংস করবার এই অর্থ যদি মানবকল্যাণে ব্যয় করা হত তাহলে মানব সন্তানই লাভবান হত। কিন্তু আমরা সভ্য জগতের কাছ থেকে সে সচেতনতা কেন পাচ্ছি না? OIC সম্মেলন হয়ে গেল। একটা ভালো রেজুলেশন নেওয়া গেল, ব্যস ঐ পর্যন্তই। বসনিয়ার মুসলিম নারীর সম্ভ্রম বাঁচাবার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেবার মতো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না কেন ?

অনুন্নত দেশের প্রতিকূল পরিবেশে রাজনীতি করছি—সমাজের বঞ্চিত মানুষের জন্য। সমাজের লাভবান গোষ্ঠী কোনোদিনই তা পছন্দ করে না। কারণ লাভবান গোষ্ঠী হচ্ছে সংখ্যায় ক্ষুদ্র, বঞ্চিত গোষ্ঠী সংখ্যায় অনেক বড়। কিন্তু যারা ক্ষুধার্ত পীড়িত ক্ষীণ কণ্ঠের অধিকারী, তাদের পক্ষ নিতে গিয়ে আমাকে অনেক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং কাজ করতে হচ্ছে। কিন্তু আমি যখন দেখি কী ভয়ানকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে তখন আমার মন ব্যথিত হয়। মনে হয় অনেক কিছু। কিন্তু অবস্থানগত কারণে আমার শক্তি সীমিত। তাই আমার আহ্বান, বিশ্ব মানবতার কাছে—বসনিয়ার

বোনদেন সম্ভ্রম রক্ষা করবার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। বিশ্ববিবেক জাগ্রত হোক, বিশ্ব মুসলিম সমাজের কাছে আমার আকুল আবেদন, ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসুন—মা-বোন-ভাই ও শিশুদের রক্ষা করবার জন্য। বন্ধ হোক যুদ্ধ, রক্ষা করুন মানব সন্তানদের। আর অস্ত্র তৈরির অর্থ ব্যয় হোক মানব কল্যাণে। জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা এ বিষয়ে বাস্তবমুখী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, এ লড়াই বন্ধ হবে—এটাই আমাদের কাম্য।

৪

মাত্র কিছুদিন আগে মানবতা লঙ্ঘনের জঘন্য ঘটনা ঘটল আমাদের দেশে। মৌলভীবাজার জেলায় কমলগঞ্জ থানার ছাতকছড়া গ্রামের মেয়ে নূরজাহানকে গ্রাম্য বিচারে দ্বিতীয় বিবাহ অবৈধ ঘোষণা করে হাঁটু সমান গর্তে দাঁড় করিয়ে ১০১টি পাথর ছুড়ে শাস্তি দেওয়া হয়। সেই আত্মগ্লানিতে সে আত্মহত্যা করে। কিন্তু এটা তো হত্যার শামিল। বিচারের নাম প্রহসন করে অনুরূপ আরও একটি ঘটনা ঘটেছে। ফরিদপুর জেলার মধুখালী থানার শ্রীপুর গ্রামের তরুণী তিন সন্তানের মা নূরজাহানকে ঘর ছেড়ে যাবার অভিযোগে বাঁশের খুঁটিতে বেঁধে সন্তানের সামনে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। দেশে প্রচলিত আইনের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় অপব্যাখ্যা দিয়ে মানবতাবিরোধী এই কর্মকাণ্ড সভ্য সমাজকে যেন ব্যঙ্গ করছে। নারী বলেই কি তার প্রতি এই সভ্যতা বিবর্জিত বৈষম্য, নির্যাতন?

বাংলাদেশের নারী সমাজ বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। দুর্ভিক্ষের অভিশাপে খাওয়া-পরার অনিশ্চয়তার কারণে কাজের সন্ধানে নারীরা দালালদের খপ্পরে পড়ে ভারত, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যে পাচার হচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতারণার শিকার হয়, দেহ ব্যবসায় বাধ্য করা হয় তাদের। পাকিস্তানের আইনজীবীদের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায় পাকিস্তানে এ পর্যন্ত ২ লক্ষ বাঙালি নারী বিক্রি হয়ে গেছে এবং ২১০০ জন বিভিন্ন কারাগারে বন্দি রয়েছে। যাদের উদ্ধারের

ব্যাপারে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সরকার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ এখন পর্যন্ত করে নাই।

বাংলাদেশ অত্যন্ত দরিদ্র দেশ। মানুষের জীবনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ হয় না। প্রায় ৮৬ ভাগ জনগণ দারিদ্র্যসীমার নিচে গ্রামে বসবাস করে। আর এই অভাব-অনটন দারুণ প্রভাব ফেলে সমাজের উপর, রাষ্ট্রের উপর; যার ফলে মানুষ পদে পদে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। জীবনের ন্যূনতম চাহিদা আহার, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, কাজের সুযোগ মানুষ পাচ্ছে না। যে কারণে আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশের পটভূমিতে মানবাধিকারের অর্থ অনেক বিস্তৃত। এখানে সামাজিকভাবে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য প্রকট, নির্যাতন বেশি। রাষ্ট্রীয়ভাবেও শোষণ রয়েছে। আমাদের সংবিধান প্রদত্ত অধিকার থেকেও মানুষ বঞ্চিত।

বাঙালি কবি চণ্ডীদাস বলেছেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' আজ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সেই মানুষ হচ্ছে বঞ্চিত, শোষিত ও অবহেলিত।

এই অন্যায়-অত্যাচারের হাত থেকে মানব সন্তানকে রক্ষা করা আজ সকলের দায়িত্ব। মানবাধিকার রক্ষার জন্য বিশ্ববিবেক জাগ্রত হোক আমাদের এই কামনা। আমরা অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব চাই। যে অস্ত্র মানবতাবিরোধী কাজে ব্যয় হচ্ছে, সেই অস্ত্র প্রস্তুত করা বন্ধ করে তা মানবকল্যাণে ব্যয় করা হোক। বাংলাদেশসহ ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, সুদান ও ভুটানের শোষিত মানুষ, ক্ষুধার্ত শিশুদের বাঁচার জন্য এই অর্থ ব্যয় করার দাবি জানাচ্ছি। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন এই বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে আমি সেই প্রত্যাশা রাখি।

২৪ মে, ১৯৯৩

শিক্ষিত জনশক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত

একটি জাতিকে গড়ে তুলতে হলে প্রথম সোপান হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আমরা যদি বাংলাদেশের চির অবহেলিত দারিদ্র্যপীড়িত অসহায় জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি ও সার্বিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করি তাহলে শিক্ষাই হচ্ছে পূর্বশর্ত।

বঙ্গবন্ধুর জীবনব্যাপী সংগ্রামের সাধনা ছিল, বাংলার মানুষের স্বাধীনতা। তিনি বলেছেন– 'আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন খাদ্য পায়, বস্ত্র পায়, বাসস্থান পায়, শিক্ষার সুযোগ পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়।'

জাতির জীবনে শিক্ষার অসীম গুরুত্ব সম্বন্ধে বঙ্গবন্ধুই আমাদের পথ প্রদর্শন করে গেছেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর পরই জাতির জনক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজাবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্যে তিনি শ্রদ্ধেয় বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাবিদ ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ১৯৭৩ সালে ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বঙ্গবন্ধুর নিকট পেশ করেন। জাতির দুর্ভাগ্য, সেই মূল্যবান রিপোর্ট-এর সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করার সময় তিনি পাননি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের কালো রাত্রিতে স্বাধীনতা বিরোধীচক্র ও তাদের দেশীয় এজেন্টরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শহিদ হবার পর পর্যায়ক্রমিকভাবে যারা ক্ষমতায় আসে তারা এ

বিষয়ে আর কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করে নাই। অথচ সেই গুরুত্বপূর্ণ দলিল থেকে এখনও আমরা অনেক বিষয়ে দিকনির্দেশনা পেতে পারি।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রশ্নে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ব্যর্থতা থেকে আমাদের অনেকের মনেই স্থিরবিশ্বাস জন্মেছে যে শিক্ষাহীন নিরক্ষর জাতিকে নিয়ে আমরা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারব না। শিল্পায়ন, কৃষির আধুনিকীকরণ, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি প্রযুক্তি আহরণ ও প্রয়োগ, রপ্তানিবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব দূরীকরণ—বস্তুত জাতিগঠন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুততর করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয়ে আমাদের বিশাল নিরক্ষর জনসংখ্যা ও শিক্ষার নিম্নমান একটা বড় প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা দিয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার উদাহরণ দিতে চাই না। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি, শিক্ষার সঙ্গে উন্নয়নের গভীর ও প্রত্যক্ষ যোগসূত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাপান যখন শিল্পায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে তখন সে দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার আলো সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল।। জাপানের সাধারণ মানুষও তখন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরি প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল। পরবর্তীকালে, এই শতাব্দীর মধ্যভাগে, কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও গণচীনে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সূচনাতেই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রমকে বাস্তবায়িত করা হয়েছে। এর ফলে এসব দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা এসেছে এবং তারা দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাসে আমি চীন সফর করে এসেছি। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি এই দেশটির বিস্ময়কর অগ্রগতি আমাকে অভিভূত করেছে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও বাজার অর্থনীতির সমন্বয় সাধন করে চীন সমগ্র জাতির কর্মশক্তি ও সৃজনশীলতাকে জাতি গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিয়োজিত করেছে। আমার বিশ্বাস, তাদের সাফল্যের অন্যতম কারণ হচ্ছে তাদের দক্ষ, শিক্ষিত ও পরিশ্রমী জনশক্তি। শুধু পূর্ব ও দক্ষিণ-

পূর্ব এশিয়ায় নয়, দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, এই উপমহাদেশের অন্যান্য দেশগুলোও শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এরই পাশে আমরা বাংলাদেশে দ্রুতবর্ধমান নিরক্ষর জনসখ্যা নিয়ে নিদারুণ দারিদ্র্যের তাড়নায় আবর্তিত হচ্ছি।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং স্তরে জটিল সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যা তীব্রভাবে বিরাজমান প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে। শিক্ষা পদ্ধতি. স্কুলগুলির দৈন্যদশা, শিক্ষক-শিক্ষিকার অপ্রতুলতা, সর্বোপরি অপর্যাপ্ত স্কুল, গ্রামবাসীর আর্থিক দীনতা, যাতায়াতের অব্যবস্থা, সবকিছু মিলিয়ে এক করুণ অবস্থা বিরাজমান। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতাকেই আমি আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী. মৌলিক ও জরুরি সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করব। শতাধিক বৎসর যাবৎ এই দেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে কিন্তু এতদিনের চেষ্টার ফলেও দেশে শিক্ষিতের হার তিরিশের বেশি উপরে উঠেনি। বরং গত চার দশক যাবৎ শাসকবর্গের বহু বক্তৃতা-বিবৃতি ও ঘোষণা সত্ত্বেও বাংলাদেশে ২ কোটি ২০ লক্ষ স্কুলবয়সী বালক-বালিকা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল ব্যবস্থার আওতার বাইরে অবস্থান করছে। বলাই বাহুল্য, এরই প্রত্যক্ষ ফল আমাদের বিশাল অশিক্ষিত বয়স্ক জনসংখ্যা।

জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে নিরক্ষর বয়স্ক নারী-পুরুষের সংখ্যা ৪ কোটি ২০ লক্ষ। পরিসংখ্যান দিয়ে আমি এই উদ্বোধনী বক্তব্যকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না, কিন্তু কয়েকটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাই আজ আমরা কোথায় অবস্থান করছি। জাতিসংঘের সূত্র অনুযায়ী বাংলাদেশের বয়স্ক শিক্ষিতের হার শতকরা ৩৫.৩ ভাগ কিন্তু প্রতিবেশী ভারতে এই হার শতকরা ৪৮.২ ভাগে পৌঁছে গেছে। শ্রীলংকায় বয়স্ক শিক্ষিতের হার শতকরা ৮৮.৪, থাইল্যান্ডে শতকরা ৯৩, ইন্দোনেশিয়ায় শতকরা ৮১.৬ এবং মালয়েশিয়ায় ৭৮.৪, যুদ্ধবিধ্বস্ত ভিয়েতনামেও বয়স্ক শিক্ষিতের হার শতকরা ৮৭.৬ ভাগ। চারদিকের

দ্রুত উন্নয়নশীল ও শিক্ষার আলোকে উজ্জ্বল জাতিগুলোর পাশে বাংলাদেশ শিক্ষাহীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত দ্বীপ হিসাবে বিরাজ করছে। এ শুধু আমাদের লজ্জারই কারণ নয়, উদ্বেগেরও কারণ। আমাদের আজ বলতে হচ্ছে, এদেশের সরকার এবং সামগ্রিকভাবে সমাজ কি আন্তরিকভাবে নিরক্ষরতা দূর করতে চেয়েছে? আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে, এশিয়ার অন্যান্য দেশ যা পেরেছে, বাংলাদেশ তা পারেনি কেন?

বিএনটি সরকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করেছেন বলে দাবি করেছে। যেখানে স্কুলের সংখ্যা বাড়েনি, শিক্ষকের সংখ্যা বাড়েনি, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি বা যেখানে কোনো অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি, সেখানে শুধু সরকার প্রধানের ঘোষণার ফলেই কি সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়ে যাবে? এসব কি ভাওতাবাজি নয়? শুধু গালভরা বুলি দিয়ে তো দেশের মানুষ শিক্ষিত হয়ে যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন হল সার্বজনীন শিক্ষার একটা ব্যাপক কার্যক্রম প্রণয়ন করা এবং জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে তা বাস্তবায়িত করা। সার্বজনীন শিক্ষার একটা ব্যাপক কার্যক্রম প্রণয়ন করে জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে তা বাস্তবায়িত করা প্রয়োজন। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতির এই কলঙ্ক দূর করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের লক্ষ্য আগামী দশ বছরের মধ্যেই দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। এ কাজ শুধু সরকারের নয়। বর্তমান সরকার ইতোমধ্যেই অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো শিক্ষা বিষয়ে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বর্তমান সরকারের লক্ষ্যবিহীন ও দুর্বল নেতৃত্বের হাতে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে আমরা স্বস্তি পেতে পারি না। তাই আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ শুধু শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েই বসে থাকবে না; বরং আমরা এখন থেকেই এ বিষয়ে সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করব, সংগঠিত করব এবং কর্মতৎপর করে তুলব।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য আমরা আমাদের সংগঠনের নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের সহায়তায় কার্যক্রম অচিরেই শুরু করব। অবশ্য আমাদের নেতা-কর্মীরা ইতোমধ্যেই স্ব স্ব এলাকায় স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। যে কোনো জেলায়, থানায় বা গ্রামে গেলে আমি এ বিষয়ে খোঁজ নিই এবং খুব কম এলাকাই আছে যেখানে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নাই। তবে এই উদ্যোগ আরও ব্যাপক করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি ছাত্রদের কাজে লাগাব। ডিগ্রী ও মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ হবার পর ছাত্রদের হাতে সময় থাকে সে সময়টা তাদেরকে নিজ নিজ গ্রাম অথবা তাদের পছন্দমতো যেকোনো গ্রামে পাঠিয়ে দিতে হবে। যে সমস্ত থানায় কলেজ আছে সেই কলেজে প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষ অথবা স্কুলের হেডমাস্টারের নেতৃত্বে ঐ থানার সমস্ত কলেজ ও স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে একটা কমিটি করা যেতে পারে। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কার্যক্রম চালু করা যায়। এই ছাত্ররা শিক্ষকদের সহায়তায় এই কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ছাত্রদের তিন মাসের জন্য গ্রামে পাঠাতে হবে। তাদের নিজ গ্রাম হলে তো কথাই নেই, অন্য গ্রাম হলে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করবে। আমরা এদের হাত খরচের ব্যবস্থা করব। একজন ছাত্র কম করে হলেও পাঁচজন নিরক্ষর মানুষকে অক্ষর জ্ঞানদান করবে। যে অধিক সংখ্যক মানুষকে অক্ষর জ্ঞানদান করতে পারবে তাকে পুরস্কার দেবার ব্যবস্থাও থাকবে। এই কার্যক্রম সফল করার জন্য সরকারের সহযোগিতা দরকার, স্থানীয় প্রশাসন যদি সহযোগিতা না করে তাহলে সফল হওয়া কঠিন।

ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের দিয়ে আমরা অচিরেই এই কার্যক্রম শুরু করব। বিভিন্ন থানার স্থানীয় ছাত্রলীগ কর্মীরা গ্রামে গ্রামে যাতে এই কার্যক্রম চালায় তার উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের শিক্ষা বিষয়ক যে কমিটি রয়েছে সেই কমিটি এ বিষয়ে একটা পরিপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং কার্যক্রম অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শুরু করা হবে।

বাংলা ভাষায় একটা কথা আছে, 'পেটে খেলে পিঠে সয়', কথাটা অত্যন্ত বাস্তব। আমাদের দেশে অসংখ্য বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে রেজিস্ট্রিকৃত, কিন্তু সেসব স্কুলের শিক্ষকরা ভাতা পান মাত্র পাঁচশত টাকা। একটা পিয়নের বেতনও এর থেকে অনেক বেশি। এমন কি আজকাল বাড়িতে কাজের লোক রাখতে গেল তার থেকে বেশি বেতন দিতে হয়, সঙ্গে খাওয়া, পরা, চিকিৎসা তো আছেই। আমরা যদি কারো কাছ থেকে পর্যাপ্ত শ্রম আদায় করতে চাই তাহলে সে পরিবেশও সৃষ্টি করতে হবে। কিছুদিন ধরে প্রাথমিক শিক্ষকরাও তাদের ভাতা পনেরো শ টাকা করার জন্য দাবি জানিয়ে আন্দোলন করছেন, কিন্তু বিএনপি সরকার এ বিষয়ে কোনো দৃষ্টিই দিচ্ছে না। আমি তো মনে করি তাদের দাবি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত।

সকাল দশটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত শ্রম দেবেন, অথচ সংসার চালাবার মতো ব্যবস্থাও হবে না—এটা হতে পারে না। তাছাড়া যাদের হাতে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরি হবে তাদেরকে দেখার দায়িত্ব অবশ্যই সরকারকে নিতে হবে। এলাকার সচ্ছল ব্যক্তি ও পরিবারগুলিরও এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

শিক্ষার সাথে সাথে স্বাস্থ্যের দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে। সকাল দশটায় একজন ছাত্র বাড়ি থেকে স্কুলে আসে, বিকাল চারটায় ছুটি হয়, দুপুরে কোনো টিফিনের ব্যবস্থা থাকে না। ঢাকা শহরের কিছু স্কুলে থাকলেও শহরের বাইরে এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা নাই। পেটে ক্ষুধার জ্বালা থাকলে পড়ায় মন বসবে কিভাবে? আমি ভাবলে অবাক হয়ে যাই আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা কত কষ্ট করে লেখাপড়া করার জন্য। মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে অধিকাংশকে স্কুলে যাতায়াত করতে হয়। রোদ বৃষ্টি কাদা পানি ভেঙে গ্রামের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাতায়াত করে। যাতায়াত ব্যবস্থারও দ্রুত উন্নতি সাধন করা একান্ত প্রয়োজন।

এছাড়া শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিদানের জন্য প্রতি স্কুলে টিফিনের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এ

প্রসঙ্গে আমি একটা প্রস্তাব করছি, যেহেতু আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী একটা কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন সেটা হল 'ডাল ভাত'। সবার জন্য 'ডাল ভাত' নিশ্চিত করতে চান। তিনি যদি প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে টিফিন পিরিয়ডে বিনা পয়সায় ছাত্র ছাত্রীদের 'ডাল-ভাত' বিতরণের ব্যবস্থা নেন—এটা খুব কম খরচে হয়ে যাবে। আগামী বছরের বাজেটে এ বিষয়ে অবশ্যই বরাদ্দ থাকবে আশা করি। আমরা বিরোধী দল থেকে এ ব্যাপারে অবশ্যই সহযোগিতা করব। এই কর্মসূচিতে আর একটা বিষয় খুব গুরুত্ব পাবে সেটা হল দেশের নিরক্ষরতা দ্রুত দূর হবে।

যে সমস্ত শিশুরা স্কুলে যাচ্ছে না বা বাবা-মা স্কুলে পাঠাচ্ছে না তারাও উৎসাহিত হবে। তারা যখন দেখবে তাদের সন্তান অন্তত এক বেলা পেটভরে খেতে পারবে তখন তারাও স্কুলে পাঠাতে শুরু করবে। স্কুলের প্রতি আকর্ষণ গড়ে তুলতে আমাদের মতো দরিদ্র দেশে এর থেকে বড় আকর্ষণ আর কি হতে পারে? এ বিষয়ে কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষিকার সঙ্গেও আমি আলাপ করছি। গত ১৬ জানুয়ারি মধুপুর গিয়েছিলাম জনসভা করতে, সেখানে কাকরাইদ স্কুলের শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। তাদের এ প্রশ্নটা করলাম, তখন তারাও সায় দিলেন এবং এতে যে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

বিদেশেও এ ব্যবস্থা আছে। লন্ডনে আমার ছেলেমেয়েরা যখন পড়াশোনা করত তখন তাদের স্কুল থেকে লাঞ্চের ব্যবস্থা করা হত। সামান্য কিছু অর্থ ছাত্রদের পক্ষ থেকে স্কুলে দিতে হত। উন্নত দেশেও যখন এ ব্যবস্থা আছে আমাদের মতো দরিদ্র দেশে তো আরও বেশি প্রয়োজন।

নিরক্ষরতা দূর করা এবং শিশুদের স্কুলগামী করার জন্য এ পরিকল্পনা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া এর সঙ্গে গ্রামের অনেক মানুষের কর্মসংস্থানও হয়ে যাবে। অনেকে প্রশ্ন করবেন, ভাত খাওয়াতে গেলে রান্না-বান্না থালা-বাসন ইত্যাদি ঝামেলা হবে। মাটির থালা এক বা দুই

টাকায় পাওয়া যাবে। রান্নার হাঁড়িপাতিল একবার যোগাড় করলেই হয়ে যাবে। স্থানীয় মানুষের কাছ থেকেও সাহায্য পাওয়া যাবে। একবার উদ্যোগ নিয়ে দেখতে দোষটা কি? আমাদের লক্ষ্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কাজেই এর জন্য সবধরনের সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।

সাধারণ জ্ঞান থেকেই আমরা বুঝতে পারি, একজন শিক্ষিত মাতার নিরক্ষর সন্তান কল্পনা করাও কঠিন। নেপোলিয়ন বলেছিলেন, "আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি শিক্ষিত জাতি দেব।' একজন শিক্ষিত সচেতন স্বাবলম্বী নারীই পারেন পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে। বর্তমান সরকার নারী শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে যত বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে বেড়াক না কেন, বাস্তবক্ষেত্রে তা কার্যকর করতে পারেনি। ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক নারীশিক্ষা চালু হয়েছে অথচ অনুদান কমানো হয়েছে, ফলে স্কুলগুলির টিকে থাকাই কষ্টকর হয়ে পড়েছে। নতুন করে ছাত্রীসংখ্যাও বাড়েনি, নতুন স্কুলের সংখ্যাও বাড়েনি। বিশেষ করে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ঘরের মেয়েরা ভর্তি হবার, বই খাতা কেনার এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কথা চিন্তাও করতে পারে না। অবৈতনিক কর্মসূচি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে এ দিকটাও অবশ্যই ভাবতে হবে। এ কর্মসূচির জন্য যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক অর্থ সাহায্য এসেছে তা অবশ্যই টার্গেট গ্রুপের জন্য ব্যয় করতে হবে। যেখানে অবৈতনিক ব্যবস্থা চালু হবে সেখানে পর্যাপ্ত সরকারি অনুদান থাকতে হবে। শুধুমাত্র পৌসভার বাইরে নয়, বঙ্গবন্ধুর সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারাদেশে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রী বেতন মওকুফ করতে হবে। সাথে সাথে আমাদের ভাবতে হবে ঐসব বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরীর কথা যাদের বয়স এখনও বিশেষ কোঠা পার হয়নি অথচ তারা শিক্ষার আলো থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। আগত একবিংশ শতাব্দীতেই এসব কম ভাগ্যবান তরুণ-তরুণী অশিক্ষিত হিসাবেই তাদের জীবন অতিবাহিত করবে। তাদের প্রতি কি সমাজের, বিশেষত যারা রাষ্ট্র ও সমাজের নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত, তাদের কোনো দায়দায়িত্ব নেই?

আমি একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি যে, আপনারা অনেকেই ভাবেন ঐসব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কথা যারা মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করেও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। এদের অনেকেই দ্বার থেকে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং শুনতে পাচ্ছে 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী'। তাদের কথা অব্যশই ভাবতে হবে এবং তাদের জন্য উচ্চশিক্ষার পথ প্রশস্ত করে দিতে হবে। কিন্তু আমি তাদের কথা ভাবতে চাই, যারা মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি। আমরা কি ভেবে দেখেছি তাদের সংখ্যা কত? এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আবার পরীক্ষা দিলে পাস করবে কিন্তু অধিকাংশই ব্যর্থ হবে। এসব লক্ষ লক্ষ হতাশ-হৃদয় তরুণ-তরুণী সমাজের কোথায় তলিয়ে যায় কেউ তার হদিস রাখে না। আমি তাদের কথা ভাবতে চাই। তারাও অনেক স্বপ্ন, অনেক কল্পনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। জীবনের প্রথম লগ্নেই এরা ব্যর্থতা ও হতাশার গ্লানিতে নিমজ্জিত হয়েছে। আমি এই সম্ভাবনাময় বিরাট জনশক্তিকে হতাশার তিমির থেকে কর্মের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনতে চাই। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে এদের দেশের সম্পদ উৎপাদনে ও গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করতে হবে। আমরা এদের হাত ধরে তুলব এবং সমাজের দায়িত্ববান নাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করব। এই লক্ষ্যে সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

আমি আরও একটি দিক নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। শৈশব-কিশোরকাল হচ্ছে সৃজনশীল প্রতিভা চর্চার শ্রেষ্ঠ সময়। লেখাপড়া ছাড়াও শিল্প সংস্কৃতি খেলাধুলা এবং কারিগরি ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রতিভা চর্চার জন্য ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই সুযোগ দিতে হবে। মেধা ও মনের বিকাশ লাভ ঘটলে অবশ্যই একদিন সমাজ ও দেশের উন্নয়নের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে দায়িত্ববান হবে। ভবিষ্যতের জন্য তাদের উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত মেধার মূল্যায়ন করতে হবে।

শিক্ষার নিম্নমুখী মান নিয়ে আমরা সবাই চিন্তিত। কিন্তু আমরা এও জানি, বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে কারিগরি প্রযুক্তি শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কার না করে সার্বিকভাবে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা সম্ভবপর হবে না। তবে প্রথমেই আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। ছাত্র রাজনীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বদানে নিজেকে গড়ে তোলা। গত ১৮ বছর ধরে গৌরবময় ছাত্র-রাজনীতিকে কলুষিত করা হয়েছে, অনেক মেধাবী ছাত্র নিহত হয়েছে। এ বিষয়ে আমার এবং আওয়ামী লীগের বক্তব্য অতি স্পষ্ট। আমরা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের বিরোধী। আমি মনে করি, সন্ত্রাসীরা কোনো রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাস করে না। তারা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত দলের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করে সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের সন্ধানে থাকে। ক্ষমতাসীন দল যদি এদের লালন-পালন করে তাহলে দেশের শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করা সম্ভবপর হবে না। কোনো গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক সরকারই সন্ত্রাসীদের দলীয় সমর্থনের আড়ালে পালন করতে পারে না। আমার দাবি আইন অনুসারে এদের কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। কিন্তু কঠোর হস্তকে নিরপেক্ষ হস্তও হতে হবে। দেশের সচেতন ও বিবেকবান মানুষ কি বলবেন যে, বিএনপি সরকার ক্যাম্পাসের সন্ত্রাস ও হানাহানি নিরপেক্ষভাবে দমন করার চেষ্টা করছে? দেশবাসী পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে এই সরকার কিভাবে সন্ত্রাস বিরোধী আইনকে প্রতিপক্ষের ছাত্রদের নির্যাতনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে—জাতীয় জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে নজীরবিহীন দলীয়করণের উদাহরণ স্থাপন করেই এই সরকার ক্ষান্ত নন, এরা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী ও অস্ত্রধারী ক্যাডার সৃষ্টি করে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। অস্ত্রের ঝংকার, চাঁদা আদায় ও অর্থের লেনদেন আমাদের তরুণ সমাজের একটা অংশকে বিভ্রান্ত করছে। টেন্ডার দখলের রাজনীতি কি

সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সম্ভবপর ? বিএনটি সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ছাত্রদের দুর্নীতি শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে ছাত্রদের নৈতিক অধঃপতন ঘটানো হচ্ছে। কলেজগুলিতে সারা বছরের বেতন পরিশোধ করে ছাত্রদের ভর্তি করে দলে টানা হচ্ছে, ভোটার বানানো হচ্ছে। কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য তারা এসব প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে কলেজ কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব সৃষ্টি করা হচ্ছে। স্কুল থেকে সদ্য আগত কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে দুর্নীতির হাতেখড়ি দেয়া হচ্ছে। এই সরকারকে এইসব কার্যকলাপের জন্য জাতির নিকট অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। কারণ বিএনটি সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ ও টেন্ডার ছিনতাইকারীদের সমর্থনে রাজনীতি করে। তাদের কথায় ও কাজে প্রমাণ পাওয়া যায়। বিএনপির তথ্যমন্ত্রী বলেছেন, ছাত্রদের অস্ত্র দিয়েছেন আন্দোলন করার জন্য—কিন্তু এরশাদের পতন তো সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে হয়নি, গণআন্দোলনে হয়েছে, এই মন্ত্রীই আবার বলেছেন, তাদের হাতে অস্ত্র না থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দখলে থাকবে না, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং বলেন, সন্ত্রাস করেন শান্তির জন্য। পাঠক সমাজ দেখুন গণতন্ত্র চর্চার নমুনা। আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করতে চাই, শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে আমরা বদ্ধপরিকর।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবমুখী করে গড়ে তুলতে হবে। সাম্প্রতিক চীন সফরকালে আমি সাংহাই, কোয়ানসচো ও সেনজেন নগরীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে এসব বিষয়ে মত বিনিময় করেছি। আমি অবাক হলাম, ঐসব নগরীর প্রায় ষাট ভাগ ছাত্রছাত্রী নিম্নমাধ্যমিক পরীক্ষার পরই, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পথ বেছে নেয়। উপস্থিত সম্মানিত বিশেষজ্ঞদের নিকট আমার আবেদন, আপনারা ভেবে দেখুন, কিভাবে আমরাও বাংলাদেশের বিশাল জনশক্তিকে দক্ষ ও উৎপাদনমুখী জনশক্তিতে পরিণত করতে পারি। গড্ডলিকা প্রবাহের মতো ডিগ্রির জন্য ব্যাকুল ও করুণ প্রয়াস আমাদের তরুণ সমাজকে

অভিশপ্ত বেকারত্বের দিকেই ধাবিত করছে। এই অশুভ চক্রের ঘুরপাক থেকে তাদের উদ্ধার করতে হবে। প্রতিটি ছাত্রছাত্রী যাতে তাদের নিজস্ব স্বাভাবিক মেধা-মনন, ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুযায়ী পেশা বেছে নিতে পারে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকদের চাপে গতানুগতিক শিক্ষা শুধু বেকারের সংখ্যাই বৃদ্ধি করছে। অর্জিত শিক্ষাকে কখনোই স্বার্থসিদ্ধি বা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নয়, সমাজ ও জাতির কল্যাণের স্বার্থে আমরা বিনিয়োগ করতে চাই। দেশের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে আমরা উল্লেখ করেছি— সকলের জন্য স্বাস্থ্য, সকলের জন্য শিক্ষা ও সকলের জন্য বাসস্থান ইত্যাদি কর্মসূচিগুলোর আওতায় সুনির্দিষ্টভাবে দরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্য, দরিদ্রের জন্য শিক্ষা, দরিদ্রের জন্য বাসস্থান ইত্যাদির লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

বাংলাদেশের সমস্যার অন্ত নাই। এর মধ্যে শিক্ষার সমস্যা শুধু জটিল ও গুরুত্বপূর্ণই নয়, নানা কারণে এর সমাধান অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত অদক্ষ শ্রমশক্তি, দারিদ্র্যের চাপে নিষ্পেষিত কৃষক সমাজ—এসব নিয়ে আমরা শুধু পিছিয়েই পড়ছি। বিশ্বের দিকে দিকে আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে জ্ঞানের পরিধি বিস্ময়করভাবে প্রসারিত করে মানব জাতিকে নতুন দিগন্তের দিকে ধাবিত করছে। বাংলাদেশের মানুষই কি শুধু অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের তিমিরে নিমজ্জিত হয়ে থাকবে? সভ্যতার ইতিহাসে বাঙালি জাতি কি তার মেধা-মনন-শ্রমশক্তির কোনো অবদান রাখবে না? আমার বিশ্বাস আমরা যদি নিরক্ষরতা দূর করে বাঙালি জাতিকে অশিক্ষার অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসতে পারি তবে এই বাঙালি জাতিও নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে বিশ্বসভায় স্থান করে নিতে পারবে।

১৯ জানুয়ারি, ১৯৯৪

আমাদের চেতনার অগ্নিশিখা

বেগম জাহানারা ইমাম আর আমাদের মাঝে নেই। গত ২৫ জুন তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু যাবার আগে মানুষের চেতনায় এক অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন। মনে হচ্ছে কী এক যাদুমন্ত্রে সুপ্ত মানুষকে জাগ্রত করে গেছেন। যার প্রয়োজন ছিল এই দেশ ও জাতির জন্য।

আমাকে মাঝে মাঝে বলতেন, "তুমি আমার মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছ। আমি ঘরে বসে লেখালেখির কাজ করতাম। এর মধ্য দিয়েই যা বলার বলে যেতাম। কিন্তু যেদিন তুমি আমার বাড়ি গেলে, কথা বললে কী যেন হয়ে গেল আমার মধ্যে। আমি নতুন করে ভাবতে চেষ্টা করলাম। বোধ হয় এই আন্দোলনই আমাকে টেনেছিল তখন।'

তার 'একাত্তরের দিনগুলি' বইটি যখন আমি পড়তাম এক একটি ঘটনা আমার কাছে ছবির মতো মনে হতো। ঐ সময় ঢাকায় আমি, মা, রাসেল, রেহানা, জামালসহ পাক হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি ছিলাম। পাকিস্তানি হানাদারদের অত্যাচার নির্যাতন আমরা দেখেছি ও শুনেছি। বন্দি অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশনের আওয়াজ না পেতাম মনে হত যেন মরে আছি। মুক্তিযোদ্ধাদের বোমা ফাটার বা অস্ত্রের আওয়াজ ছিল আমাদের কাছে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা, বন্দিজীবনের আশা-ভরসার সাথী। ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার ১৮ নম্বর রোডের একটি বাড়িতে আমরা বন্দি ছিলাম। ঐ

রোডেও অনেক সময় মুক্তিবাহিনী অপারেশন চালায়। যদিও ওদের অপারেশনের পর আমাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়েই যেত। রাতে বাতি বন্ধ করে দিত। বাজার-হাট রান্না প্রায় বন্ধ থাকত। খাওয়া-দাওয়া করতে দিত না। খেতে বসলেই জানালার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে অস্ত্র তাক করে বলতো, 'খাওয়া শেষ। বাতি বন্ধ করে দেন, আর খাওয়া লাগবে না।'

এমনি নানা ধরনের অত্যাচারের বর্ণনা এ লেখার ক্ষুদ্র পরিসরে দিতে চাই না।

ঐ বই পড়তে পড়তেই মন থেকে দারুণ একটা তাগাদা অনুভব করলাম যে তাঁর সঙ্গে দেখা করব। তাঁর কথা সবসময়ে শুনতাম অনেকের কাছে। দুরারোগ্য ক্যান্সার নিয়ে উনি বিদেশে চিকিৎসা করে দেশে ফিরেছেন। একদিন তাঁর কাছে গেলাম। প্রথম দেখা হতেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। কেন জানি না, আমার দুচোখ পানিতে ভরে গেল। আমি নিজেকে সংবরণ করতে পারলাম না। তিনি এক সন্তানহারা মা আর আমি এক মা-বাবা ভাই হারা, ব্যথিত হৃদয় নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছি। কেউ কাউকে সান্ত্বনা দিতে পারি না। কোনো কথা বলতে পারছিলাম না। শুধু চোখের পানির মধ্য দিয়েই না বলা অনেক কথা যেন বলা হয়ে গেল। উনি আমাকে শোবার ঘরে নিয়ে বসালেন। অনেকক্ষণ দুজন দুজনকে ধরে কাঁদলাম। উনি আমাকে বললেন, 'তোমার মনকে অনেক শক্ত করতে হবে। অনেক কঠিন দায়িত্ব তোমার উপর।' আমি তাঁর দোয়া চাইলাম। সমব্যথার ব্যথি একসাথে হয়েছিলাম। স্বজন হারাবার ব্যথায় ব্যথিত আমি বুকভরা যন্ত্রণা নিয়ে তার কাছে গিয়েছিলাম, তিনি সন্তানহারা বেদনায় জর্জরিত। এরপর একদিন আমার ছেলে-মেয়েকে নিয়ে যাই একজন মুক্তিযোদ্ধার মাকে দেখাবার জন্য। ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে ফুলার রোড আইল্যান্ডের উপর সমন্বয় কমিটির সভায় গিয়ে বক্তব্য রাখি। উনি তখন বিশ্রামের জন্য পাশের এক কোয়ার্টারে গিয়েছিলেন। এরপর ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে প্রথম জনসভা হল। উনি আমাকে সেই সভায়

বক্তব্য রাখতে আহ্বান করলেন এবং জনসমাগম যাতে ভালো হয় তার জন্য ব্যবস্থা করতে বললেন। আমি তার কথামত সব ব্যবস্থা করলাম, নিজেও উপস্থিত হলাম। তারপর গণ-আদালত, ঘাতক দালাল নির্মূল সমন্বয় কমিটির আন্দোলন চলাকালে তিনি যখনই আমার কাছে যে কোনো সহযোগিতার জন্য ছুটে এসেছেন, তাঁর মধ্যে একটা দৃঢ়তা দেখেছি। তিনি সব সময় বলতেন, "আমি তোমার সাহায্য ছাড়া এগোতে পারব না। যে যত কথা বলুক, আমি জানি তুমি এ আন্দোলনে আমার সঙ্গে আছ।"

গণ-আদালত বসার আগের দিন পর্যন্ত তাঁকে ভীষণভাবে অপদস্থ করা হয়, যার ফলে তিনি বাড়িতে থাকতে স্বস্তিবোধ করেননি। এমনকি গণ-আদালত যাতে না বসতে পারে তার জন্য তার উপর নানা মহল থেকে চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। তারপরও তিনি ছিলেন যথেষ্ট সাহসী। এ শিক্ষা অবশ্যই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। ১৯৯৩ সালের ১৫ মার্চ পুলিশের সাদা জিপের তাড়া খেয়েও তিনি আমার কাছে ছুটে এসেছিলেন। আমার হাত ধরে বলেছিলেন, 'আমার কালকে সভা আছে।' আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলাম জনগণ আপনার সভায় থাকবে। পরদিন সরকার কিভাবে অঘোষিত কারফিউ জারি করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান-প্রেস ক্লাব-জিপিও-বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল সকলের নিশ্চয় মনে আছে। এসব স্মৃতি আমাকে এখনও উজ্জীবিত করে রাখে।

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসের ৩০ তারিখে বাংলাদেশ থেকে জার্মানি গিয়েছিলাম। মা, বাবা, ভাই সবাইকে রেখে গিয়েছিলাম। আমার সেই বাংলাদেশ যেখানে গোলাম আজম ছিল না, যেখানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। স্বাধীনতা বিরোধীরা রাস্তায় নামতে পারত না, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারত না, দল করবার অনুমতি ছিল না, সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ ছিল।

কিন্তু ১৯৮১ সালে যেদিন দেশে ফিরলাম, মনে হল এ যেন আরেক বাংলাদেশ যেখানে আমার আপনজন কেউ বেঁচে নেই। ১৯৭৫

সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেট কেড়ে নিয়েছে আমার মা, বাবা, ভাইদের। ছোট্ট রাসেল, বয়স মাত্র ১০ বছর ছিল, তাকেও রেহাই দেয়নি। আমার মা, জানি না কি অপরাধ ছিল তাঁর? কামাল ও জামাল এবং তাদের নবপরিণীতা বধূ, যাদের হাতের মেহেদীর রং তখনও মুছে যায়নি, ঘাতকরা তাদেরও রেহাই দেয়নি। আমার চাচা শেখ আবু নাসের যার একটি পা পঙ্গু ছিল, ঐ পঙ্গু পা নিয়ে যিনি দিনের পর দিন মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন, ঘাতকরা তাকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল। মনি ভাই যিনি ১৯৬০ সাল থেকে ছাত্রদের সংগঠিত করে ছাত্র রাজনীতি করে স্বাধীনতার ক্ষেত্র তৈরি করেছেন, তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী আরজু যে আমার ছেলেবেলার খেলার সাথী ছিল, তাকেও হত্যা করেছে। সেরনিয়াবত ফুফা যিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ চরিত্রের অধিকারী। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় নিরলসভাবে কাজ করেছেন। তাঁর ১৩ বছরের মেয়ে বেবী, ১০ বছরের ছেলে আরিফ, ৪ বছরের নাতি সুকান্তসহ ভাতিজা শহীদ, বাড়ির কাজের ছেলে এবং আশ্রিত গ্রামের নাম না-জানা লোকজনকে পর্যন্ত হত্যা করেছে। কর্নেল জামিল, যিনি আমার বাবাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁকেও সামরিক বাহিনীর আইনকানুন লঙ্ঘন করে হত্যা করেছে। এখানেই ঐ ঘাতকরা ক্ষান্ত হয়নি, ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর আমাদের জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, মনসুর আলী, কামরুজ্জামানকে কারাগারে বন্দি অবস্থায় নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

স্বজন হারাবার শোক নিয়ে, বেদনায় ভরা মন নিয়ে দেশের মাটিতে ছয় বছর পর ফিরলাম। দেখলাম শুধু আমার আপনজনদেরই হারাইনি, হারিয়েছি আমার স্বাধীনতা প্রিয় স্বাধীনতাকেও, যাকে বাংলার দামাল ছেলেরা বুকের রক্ত দিয়ে অর্জন করেছিল, লাল-সবুজ পতাকা উড়িয়েছিল। বাঙালির স্বাধীন সত্তাকে বিশ্ব মাঝে প্রতিষ্ঠা করেছিল। স্বাধীনতার পরাজিত শক্তিই আজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু তাদের নেতৃত্বে রয়েছে একজন মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার, নাম

জেনারেল জিয়াউর রহমান। অবৈধভাবে জেনারেল জিয়া অস্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে নিজেকে নিজেই রাষ্ট্রপতি করে। তারপর নিজের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত রাখার স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধে যারা অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ, লুটপাট ও গণহত্যায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করেছে তাদের জেলখানা থেকে মুক্ত করে দেয়। অথচ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট দালাল আইন প্রণীত হয়েছিল। জেনারেল জিয়া তার অবৈধ ক্ষমতাকে কুক্ষিগত রাখার জন্যই সেদিন এসব ঘৃণ্য দালালদের জেলমুক্ত করে এবং ঘাতক-দালালবিরোধী যে সমস্ত আইন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারেরর জন্য বঙ্গবন্ধু করেছিলেন মার্শাল ল' অর্ডিন্যান্স-এর মাধ্যমে বাতিল করে দেয়। পরে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে সংযোজন করে।

যেমন, ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ দালাল আইন P.O, No. VIII মত ১৯৭২ এবং বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন জারি করা হয় ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে।

১৯৭৩ সালের ১৮ এপ্রিল গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গোলাম আজম গংদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়। এবং সংবিধানের ১২ ও ৩৮ অনুচ্ছেদ মোতাবেক ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা নিষিদ্ধ রাখা হয়।

৬৬ ও ১২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দালালদের ভোটাধিকার ও সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ বাতিল করা হয়।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু নিহত হবার পর ক্ষমতার চাবি জেনারেল জিয়াউর রহমানের হাতে চলে গেলে—

* Ordinance No, 63 মত ১৯৭৫ এর মাধ্যমে দালাল আইন বাতিল করা হয় ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর।
* Second Proclamation Order No –3 মত ১৯৭৫ এর প্রথম তফসিল থেকে বাংলাদেশ দালাল আইনের যে সেফগার্ড ছিল তা তুলে দেয়া হয় ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর।

* Second Proclamation Order No-3 মত ১৯৭৫ জারি করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করবার সুযোগ করে দেবার জন্য সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদের শর্তাবলি তুলে দেয়া হয় ১৯৭৬ সালে।
* Second Proclamation-এর ঘোষণা জারির মাধ্যমে সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদ তুলে দিয়ে দালালদের ভোটার হবার সুযোগ করে দেয়।
* Proclamation Order No-1 মত ১৯৭৭ জারি করে ঘাতক-দালালদের সংসদে নির্বাচন করবার সুযোগ করে দেওয়া হয়।
* Proclamation Order No-1 মত ১৯৭৭ জারি করে ঘাতক-দালালদের নির্বাচন করার ও সংসদের বসার সুযোগ করে দেয়ার জন্য সংবিধানের ৬৭৫ অনুচ্ছেদের কিছু অংশ তুলে দেয়া হয়।
* Proclamation Order No-1 মত ১৯৭৭ দ্বারা সংবিধানের ১২নং অনুচ্ছেদ তুলে দেয়া হয়।

১৯৭৬ সালের ১৮ জানুয়ারি নাগরিকত্ব ফেরত পাবার জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে বলা হয়। যে সূত্র ধরে স্বাধীনতা-বিরোধীরা বাংলাদেশে ফিরে আসার সুযোগ পায়।

১৯৭৬ সালের জুন মাসে আরও একটি অধ্যাদেশ জারি করে ১৯৭২ সালে জারিকৃত 'বাংলাদেশ কোলাবরেটরস আদেশ' বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বাতিল করে একাত্তরের ঘাতক-দালালদের মামলা তুলে নেয়া হয়। স্বাধীনতাবিরোধী চিহ্নিত কারাবন্দি শাস্তিপ্রাপ্তদের জেনারেল জিয়া মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী বানান। শহিদ পরিবারের জন্য যে সমস্ত ঘরবাড়ি বঙ্গবন্ধু বরাদ্দ করেছিলেন তাও কেড়ে নেয়া হয়। জেনারেল জিয়াই এই প্রক্রিয়া শুরু করে। তার Divide and Rule নামক কৌশল দেশের রাজনীতিতে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, আর্থ-সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষত সৃষ্টি করেছে।

জেনারেল জিয়া রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করে গদিতে বসেই গোলাম আজমকে দেশে ফিরিয়ে আনে। সংগঠন করবার সুযোগ করে দেয়। একথা আমার মনে আজ বারবার জাগে যখন জিয়া গোলাম আজমকে দেশে ফিরিয়ে আনে তখন তীব্রভাবে গোলাম আজমের বিচারের দাবি ওঠা উচিত ছিল এবং তখনই গণআদালত বসালে আজ তার নাগরিকত্ব পেত না। শিক্ষাঙ্গনে শিবিরের রাজনীতি বিস্তার লাভ করত না।

পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করে এই সমস্ত অর্ডিন্যান্স সংবিধানে সংযোজন করা হয়। গত ১৫ বছরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে, আদর্শ-উদ্দেশ্যকে সঙ্গীনের খোঁচায় নস্যাৎ করে দিয়েছে। তার উপর আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করে পরিবেশন করেছে। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে সর্বস্তরে এই প্রক্রিয়া চলছে, ফলে আমাদের দেশের যুবক-কিশোর-শিশুরা আজ আর প্রকৃত ইতিহাস জানে না। এই স্বাধীনতা বিরোধীদের মনগড়া ইতিহাস সত্যকে চাপা দিয়ে মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর ধারাবাহিকতা গত উনিশ বৎসর ধরে চলে আসছে। দীর্ঘদিন আন্দোলন সংগ্রাম করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছি। শুধুমাত্র ১৯৯০ সালের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদের পতনের পর ৪ ডিসেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত টেলিভিশনে ও রেডিওতে শুনেছি মুক্তিযুদ্ধের গান। তারপর মনে হয় যেন অদৃশ্য কোনো নির্দেশে আবার সব বদলে গেল। নির্বাচনের পূর্বে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯১ সালে গোলাম আজমের সঙ্গে বৈঠক করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিট ভাগাভাগি করল, যত সিট পাবার কথা নয় তা পেল, সঙ্গে সঙ্গে জামাতকেও নির্বাচিত হবার সুযোগ করে দিল। এত করেও পর্যাপ্ত সিট পেল না সরকার গঠন করা মতো, পরে আবার গোলাম আজম-খালেদা বৈঠক হল, মহিলা আসনের সিট ভাগাভাগি করে জামাতের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করল।

১৯৯১ সালে সংসদে জামাতের সঙ্গে সকলেই বসেছে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে বসা, আলোচনা করা, রিপোর্টসই করা সবই চলছে—এমন কি দ্বাদশ সংশোধনীতে জামাতও ভোট দিয়েছে এবং একই সঙ্গে সই করেছে।

বিএনপি অর্থাৎ জেনারেল জিয়াউর রহমান ও তার স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গোলাম আজমকে দেশে আসা ও নির্বাচনী সিট ভাগাভাগির ওয়াদা হিসেবে নাগরিকত্ব প্রদান সবই পরিকল্পিতভাবে করেছে। অপরদিকে শহিদ জননী জাহানারা ইমাম যিনি গোলাম আজমসহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে আন্দোলন করেছে এই অসুস্থ শরীর নিয়ে পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেরিয়েছেন, বেগম খালেদা জিয়া তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীর মামলা দিয়েছে।

এই আন্দোলনটা যদি ১৯৭৭ সালেই শুরু করা হত তাহলে তো গোলাম আজম ফিরে যেতে বাধ্য হত, তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা যেত। জামাতে ইসলামী পার্টি হিসেবে দাঁড়াতে পারত না। কিন্তু কেন ? কেন শুরু হয়নি ? আমি তখন দেশে ফিরতে পারিনি। আমাদের জন্য দেশে ফেরা তখন নিষিদ্ধ ছিল তাই তখনকার কথা পুরোপুরি জানি না, তবে যারা আজ আন্দোলন করেছেন তারা তো সেদিনও ছিলেন। জিয়াউর রহমানের সঙ্গেও অনেকে ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাকে বাধা দেয়া হয়নি কেন যে, এর ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলে আর কিছু থাকবে না।

১৯৯১ সালে খালেদা জিয়া ও গোলাম আজম বৈঠক এবং নির্বাচনে সিট ভাগাভাগির যে পর্যায়ে তখনই বা কেন প্রতিবাদের ঝড় উঠল না? তখন যদি তাকে বিরত করা হত তাহলে তো আর জামাত এতগুলি সিট নিয়ে পার্লামেন্টে বসতে পারত না। আমাদেরও তখন জামাতের সাথে পার্লামেন্টে বসতে হত না। একাদশ দ্বাদশ সংশোধনীতে ভোট দিতে হত না। সংসদীয় কমিটিতে বসতে হত না, সই করার প্রয়োজন হত না।

সরকার গঠনের জন্য যখন বৈঠক হল তখনও যদি চেতনার উন্মেষ ঘটত তাহলে আজ এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত না। সংসদের বিএনপি সরকারের সাথে বিরোধী দলের যে চার দফা চুক্তি হল তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। এ সম্পর্কে আমরা আওয়ামী লীগ থেকে যতবার দাবি তুলি কই সকলে তো সেভাবে সোচ্চার হচ্ছে না।

আজ শহিদ জননী মৃত্যুবরণ করলেন দেশদ্রোহীর মামলা মাথায় নিয়ে। যাঁর ছেলে স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছে, যিনি স্বামী হারিয়েছেন, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ন্যায় ও সত্যের জন্য লড়াই করেছেন, তিনি হলেন দেশদ্রোহী আর তারই পাশাপাশি যে ব্যক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয় সে পেল নাগরিকত্ব। এ লজ্জা আমরা কোথায় রাখব! এ অপমান ও গ্লানি কি করে ভুলব! শহিদ জননী একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিচার চেয়েছেন সেই অপরাধে বিএনপি নেত্রী তার নিজের বা দলের পক্ষ থেকে এতটুকু সম্মানও শহিদ জননীর প্রতি দেখালেন না। এত বড় অবজ্ঞা কেন করা হল? মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডাররা তাকে অভিবাদন জানান। মন্ত্রী মীর শওকত বলেছিলেন তার 'ম্যাডাম' অনুমতি দিলে তিনি যাবেন। কিন্তু তার ম্যাডাম তাকে সে অনুমতি দেননি, তাই তিনিও আসেননি। আসেননি তাতে জাহানারা ইমামের কোনো সম্মানহানি হয়নি। তাঁকে বাঙালি জাতি সম্মান দিয়েছে শহিদ জননী হিসেবে। মুক্তিকামী মানুষ তাকে সম্মান দিয়েছে হৃদয়ের গভীর উষ্ণতায়।

জাহানারা ইমাম যে চেতনা জাগিয়ে দিয়ে গেছেন, আজকের প্রজন্ম এতদিন যাদের মিথ্যা স্তবকে ভুলেছিল আজ তারা নিজেরাই ইতিহাসকে খুঁজে বের করবে। নিজেদের আত্মপরিচয়কে চিনে নেবে—এ চেতনা তিনি জাগ্রত করে গেছেন।

শহিদ জননী তুমি ঘুমাও শান্তিতে—আমরা জেগে রব তোমার চেতনার পতাকা তুলে ধরে।

১১ জুলাই, ১৯৯৪

স্মৃতি বড় মধুর স্মৃতি বড় বেদনার

অনেক রাত হবে। দোতলায় মায়ের ঘরে খাটে আমরা সবাই। মা, আব্বা, ভাই-বোন কেউ শুয়ে, কেউ বসে খুব গল্প করছি। আব্বাও অনেক কথা বলছেন, আমরা শুনছি। সেই আগের মতো ৩২ নং বাড়িটায় সবাই আছি। বাড়িটা একদম বিধ্বস্ত। এখানে ওখানে গুলির দাগ। আমার ঘরের পাশে ছোট্ট একটা ঘরে আলনা ও একটা আলমারি রাখা আছে। বড় একটা আয়না রয়েছে। ঐ আয়নায় গুলি করেছে ফলে অর্ধেক আয়না ভেঙে গেছে। বাড়ির ইটগুলি অনেকখানি বেরিয়ে আছে। এদিকে দরজায় একটা শাড়ি ছিঁড়ে দু'টুকরো পর্দা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। মায়ের কোলের কাছে শুয়েছিলাম আমি। উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে আমার ঘরে ঢুকলাম...

হঠাৎ টেলিফোনের শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। বুঝে উঠতে কিছুটা সময় লাগল যে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। কেন যেন মনটাই ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। স্বপ্নটা পুরো দেখা হল না। ফোনটার উপরই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। প্রায়ই এমন স্বপ্ন দেখেছি যে সেই আগের মতো সবাই একসঙ্গে ঐ বাড়িতে, মনে হয় যেন এই উনিশটি বছর আমাদের জীবনে আসেনি। মনে হয় মা-বাবা-ভাইদের স্বপ্নে দেখি ও কাছে পাই বলেই বুঝি বেঁচে আছি। সারাটা দিন নানা কাজে ও বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ, সভা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থেকে কাটিয়ে দেই। কিন্তু রাতে যখন ঘুমুতে যাই তখন চলে যাই অন্য জগতে। সে জগৎ শুধু আমার একান্ত আমার উনিশ বছর পূর্বের জীবন।

অনেক স্মৃতিভরা ধানমন্ডি ৩২ নং সড়কের বাড়ির জীবনে যেন চলে যাই। সেই আগের মতো সবাই আছে। একসঙ্গে হাসছি। কথা বলছি, কখনও রাগ করছি, ভাইবোনে খুনসুটি করছি। কখনও মিছিল আসছে। কত স্মৃতি। স্মৃতি বড় মধুর! আবার স্মৃতি অনেক বেদনার, যন্ত্রণার! ঘুম ভেঙে বাস্তব জগতে এলেই সেই যন্ত্রণা কুরে কুরে খায়। যত দিন বেঁচে রইব এ যন্ত্রণা নিয়েই বাঁচতে হবে।

ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়ি। আগামী ১৪ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি মিউজিয়াম হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে। কাজ চলছে। মিউজিয়াম করতে গেলে অনেক পরিবর্তন করতে হয়। সে পরিবর্তন কমিটি করাচ্ছে। আমি প্রায়ই যাই দেখতে। দেয়ালগুলিতে যখন পেরেক ঠোকে, জিনিসপত্রগুলি যখন সরিয়ে ফেলে বুকে বড় বাজে, কষ্ট হয় দুঃখ হয়। মনে হয় ঐ পেরেক যেন আমার বুকের মধ্যে ঢুকছে। মাঝে মাঝেই যাচ্ছি, ঘুরে দেখে আসছি যতই কষ্ট হোক। এই কষ্টের মধ্যে ব্যথা-বেদনার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। সে আনন্দ হল আমরা জনগণকে তাদের প্রিয় নেতার বাড়িটি দান করতে পারছি। জনগণের সম্পত্তি হবে ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটি। এটাই আমাদের বড় তৃপ্তি। আমরা তো চিরদিন থাকবো না কিন্তু এই ঐতিহাসিক বাড়িটি জনগণের সম্পদ হিসেবে সব স্মৃতির ভার নিয়ে ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে থাকবে। এখানেই আমাদের সান্ত্বনা। আমরা ১৯৬১ সালের ১লা অক্টোবর এই বাড়িটিতে আসি। তারপর থেকে কত গুরুত্বপূর্ণ সভা এই বাড়িতে হয়েছে। এই '৬১ সাল থেকে '৯১ সাল পর্যন্ত কত ঘটনা এই বাড়ি ঘিরে। মাঝখানে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ৮১ সালের ১১ই জুন পর্যন্ত বাড়ি বন্ধ ছিল। আব্বা শাহাদাত বরণ করার পর ওরা বাড়িটি সিল করে দেয়। তারপর আর কেউ প্রবেশ করতে পারে নাই।

মনে পড়ে ১৯৬২ সালে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। মণিভাই এই বাড়ি থেকে নির্দেশ নিয়ে যেতেন, পরামর্শ নিতেন। ১৯৬২ সালে আব্বা গ্রেফতার হন। তখনকার কথা মনে পড়ে খুব।

আমি ও কামাল পিছনের শোবার ঘরে থাকি, মাঝখানে বাথরুম, তারপরই মার শোবার ঘর। তখনও বাড়িটি সম্পূর্ণ হয়নি। আমরা যখন এ বাড়িতে এসে উঠি তখন কেবল দুটো শোবার ঘর আর মাঝের বসার ঘরটা হয়েছে। ওর অর্ধেকটায় খোকা কাকা, স্নোভাই, মণি ভাইসহ অনেক আত্মীয়স্বজন থাকত। মাঝখানে পশ্চিম দিকে ছোট্ট একটা বসার ঘর তখনও অসমাপ্ত। রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, দেখি বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি, তার মধ্যে পুলিশ। জানালার পাশে একজন দাঁড়িয়ে আর একজন অত্যন্ত সতর্কভাবে গুটি গুটি পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি পর্দার পাশে, ঘর অন্ধকারই তাই আমাকে দেখতে পায়নি। তাড়াতাড়ি কামালের খাটের কাছে গেলাম। ওকে ধাক্কা দিয়ে ওঠাতে চেষ্টা করলাম। ও চোখ খুলল, 'হাসুপা কি?'

আমি বললাম, 'পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে।' একথা বলেই তাড়াতাড়ি বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে মাকে ডাকলাম। মা ও আব্বা যখন টের পেয়ে গেছেন। মা বললেন, 'তোমার আব্বাকে ওরা অ্যারেস্ট করবে।' ঐ বাড়ি থেকেই আব্বাকে বন্দি করে নিয়ে গেল। প্রায় পাঁচ ছয় মাস আব্বা জেলে থাকেন।

১৯৬৪ সালের অক্টোবরে রাসেলের জন্ম। তখনও বাড়ির দোতলা হয়নি, নিচ তলাটা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব কোণে আমার ঘরেই রাসেলের জন্ম হয়। মনে আছে আমাদের সে কি উত্তেজনা! আমি, কামাল, জামাল, রেহানা, খোকা কাকা অপেক্ষা করে আছি। বড় ফুফু, মেজ ফুফু তখন আমাদের বাসায়। আব্বা তখন ব্যস্ত নির্বাচনী প্রচার কাজে। আইয়ুবের বিরুদ্ধে ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী করা হয়েছে সর্বদলীয়ভাবে। বাসায় আমাদের একা ফেলে মা হাসপাতাল যেতে রাজি না। তাছাড়া এখনকার মতো এত ক্লিনিকের ব্যবস্থা তখন ছিল না। এসব ক্ষেত্রে ঘরে থাকারই রেওয়াজ ছিল। ডাক্তার-নার্স সব এসেছে। রেহানা ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোট্ট মানুষটা আর কত জাগবে। জামালের চোখ ঘুমে ঢুলঢুল, তবুও জেগে আছে কষ্ট করে নতুন মানুষের আগমন বার্তা শোনার অপেক্ষায়। এদিকে ভাই না বোন!

ভাইদের চিন্তা আর একটা ভাই হলে তাদের খেলার সাথী বাড়বে, বোন হলে আমাদের লাভ। আমার কথা শুনবে, সুন্দর সুন্দর ফ্রক পরানো যাবে, চুল বাঁধা যাবে, সাজাব, ফোটো তুলব, অনেক রকম করে ফোটো তুলব। অনেক কল্পনা মাঝে মাঝে তর্ক, সেই সঙ্গে গভীর উদ্বেগ নিয়ে আমরা প্রতি মুহূর্ত কাটাচ্ছি। এর মধ্যে মেজ ফুফু এসে খবর দিলেন ভাই হয়েছে। সব তর্ক ভুলে গিয়ে আমরা খুশিতে লাফাতে শুরু করলাম। ক্যামেরা নিয়ে ছুটলাম। বড় ফুফু রাসেলকে আমার কোলে তুলে দিলেন। কি নরম তুলতুলে। চুমু খেতে গেলাম, ফুফু বকা দিলেন। মাথা ভর্তি ঘন কালো চুল, ঘাড় পর্যন্ত একদম ভিজা। আমি ওড়না দিয়ে ওর চুল মুছতে শুরু করলাম। কামাল, জামাল সবাই ওকে ঘিরে দারুণ হইচই।

দোতলায় ওঠার সিঁড়িগুলো তখনও প্লাস্টার হয়নি। মা খুব ধীরে টাকা জমিয়ে এবং হাউজ বিল্ডিংয়ের লোকের টাকা দিয়ে বাড়িটি তৈরি করেন। অত্যন্ত কষ্ট করেই মাকে এই বাড়িটি করতে হয়েছে। আব্বা মাঝে মাঝে জেলে চলে যেতেন বলে সব কাজ বন্ধ হয়ে যেত। যে কারণে এ বাড়ি শেষ করতে বহুদিন লেগেছিল। আন্দোলনের সময় বা আব্বা বন্দি থাকা অবস্থায় পার্টির কাজকর্মে বা আন্দোলনে খরচের টাকাও মা যোগাতেন। অনেক সময় বাজার হাট বন্ধ করে অথবা নিজের গায়ের গহনা বিক্রি করেও মাকে দেখেছি সংগঠনের জন্য অর্থের যোগান দিতে। কাজেই ধীরগতিতেই বাড়ির কাজ চলছিল। দোতলার সিঁড়ি আমার খুবই প্রিয় জায়গা ছিল। হাতে একটা বই নিয়ে সিঁড়িতে গিয়ে বসে পড়তে খুব ভালো লাগত। কেন তা আজও জানি না। আরজু বা শেলী আসলে আমরা সিঁড়িতেই বসতাম, গল্প করতাম। কি যে একটা আনন্দ ছিল! চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে ওখানে গিয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করতাম। স্কুল ছুটি হলেই বরিশাল থেকে আরজু আসত। আর ছোট ফুফার বদলির চাকুরি। আব্বার ভগ্নিপতি বলে আইয়ুব-মোনায়েম সব সময় তার প্রতি এমন দৃষ্টি রাখত ঘন ঘন বদলি করত। কোথাও সাত মাস, কোথাও নয় মাস—যখন যেমন

ইচ্ছা। হবিগঞ্জ থেকে রামগড়, ঠাকুরগাঁ থেকে হবিগঞ্জ—এমনি বদলি চলতই। ঢাকা হয়েই যাবার পথ ছিল। রাস্তাঘাট তখন এত ছিল না। প্রায়ই ওরা ঢাকায় আসত, তাছাড়া ছুটিতে তো আসতই। স্কুল ছুটির সময় মেজ ফুফু খালা সবাই আসতেন। মাটিতে ঢালাও বিছানা। বারান্দায় চুলা পেতে রান্না। আর সব মিলে লুকোচুরি খেলা। দিনরাত খেলার আর শেষ নেই। যেহেতু বাড়ির কাজ শেষ হয়নি। কাজ করছে, কাজেই লুকোবার জায়গাও অনেক ছিল। বাসায় যখন বেশি ভিড় হত, মিটিং থাকত, আমি ও শেলী ছাদের উপর বসে পড়তাম। অনেক সময় পানির ট্যাঙ্কির উপর বসে পা ঝুলিয়ে গলা ছেড়ে জোরে জোরে পড়তাম। বড় হয়ে গেলেও অনার্স ক্লাসের পড়াও এভাবে পড়েছি।

১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধের পূর্বে ১৯৬৪ সাল ঢাকায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হল। দাঙ্গায় বহু মানুষকে এ বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হল। দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য এবং দাঙ্গা থামাবার জন্য বঙ্গবন্ধু নিজের জীবনের উপর ঝুঁকি নিয়ে পরিশ্রম করলেন। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনলেন। এটা ছিল সরকারের একটা চাল। সরকার বিরোধী আন্দোলন থেকে জনগণের দৃষ্টি ভিন্নখাতে নেবার এক কৌশল। এখনও ঐ একই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। কত ঘটনা যে মনে পড়ে। এই বাড়ি যখন তৈরি হয়, ইট ভিজানোর জন্য পানির হাউজ তৈরি করা ছিল। চাচি হেলাল, মিনাকে নিয়ে ঢাকায় এলেন। রেহানা, জামাল, হেলাল, মিনা সারাদিন বারান্দায় খেলা করত। আমি বারান্দায় মোড়ায় বসে বই পড়ছি আর হেলাল বারান্দায় রাখা কাঠের দরজা-জানলার পাল্লার স্তূপের উপর বসে খেলছে। একবার নামছে, একবার উঠছে। এর মধ্যে হঠাৎ ও হাততালি দিয়ে উঠল 'মিনা সাঁতার কাটে, মিনা সাঁতার কাটে বলে'—জামাল দেখল মিনা হাউজে পড়ে গেছে। হাউজে নেমে মিনাকে টেনে তুলল। আমি ছুটে গিয়ে ওকে কোলে তুলে নিয়ে বাড়ির ভিতরে এলাম, বেশি পানি খায়নি, তবে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বড় একটা দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গেল। মিনা আমাদের সবার অত্যন্ত আদরের। আব্বা ওকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। এই খবর শুনলেই আমাদের উপর যে কি যাবে ভাবতেও পারছি না।

১৯৬৬ সালের কথা মনে আছে। কয়েকদিন ধরে আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটির সভা চলছিল। আমার তখন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। প্রথম বর্ষের কয়েকটা বিষয়ের পরীক্ষা হবে, যার নাম্বার দ্বিতীয় বর্ষে যোগ হবে। কিন্তু পড়ব কি! মিটিং চলছে বাড়িতে, মন পড়ে থাকে সেখানে। একবার পড়তে বসি আবার ছুটে এসে জানালার পাশে বসে মিটিং শুনি। সবাইকে চা বানিয়ে দেই। যাক সেসব। বিকেলে নারায়ণগঞ্জে বিশাল জনসভা হয় ছয় দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য। আব্বার ফিরতে বেশ রাত হল। আমরা অনেক রাত পর্যন্ত বারান্দায় বসে জনসভার গল্প শুনলাম। সেই জনসভায় আব্বাকে ছয় দফার উপর একটা সোনার মেডেল উপহার দেয়া হয়েছিল। রাত বারোটায় আব্বা শুতে বিছানায় গেলেন। আমি পড়তে বসলাম। ঐ বছরই বাড়ির দোতলার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কাজেই দোতলার পিছনের উত্তর-পূর্ব দিকের ঘরটা আমার। দক্ষিণে বড় জানালা। আমি খুব জোরে পড়তাম ঘুম তাড়ানোর জন্য। এর মধ্যে নিচ থেকে মামার চিৎকার শুনি 'পুলিশ এসেছে'। বাড়িতে ঢুকতে চায়। গেটের তালা খুলতে বলে। আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। নিচে মামা দাঁড়িয়ে। আমি পুলিশ অফিসারকে বললাম, আব্বা অনেক রাতে ঘুমিয়েছেন। এখন রাত দেড়টা বাজে, এখন কি করে ডাকব? তাছাড়া সকালের আগে কি করে বন্দি করবেন? আপনারা অপেক্ষা করুন।' আমি তাদের গেটের বাইরে চেয়ার দিতে বললাম। আর এখন কিছুতেই ডাকতে পারব না বলে জানালাম। আমি বারান্দা থেকে ঘর পেরিয়ে মাঝের বসার ঘরে এসেছি। শুনি টেলিফোন বাজছে। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। মাঝের ঘরের ছোট জানালা খোলা, আব্বা কথা বলছেন টেলিফোনে। ওপার থেকে কি বলছেন শুনছি না, তবে শুনলাম আব্বা বললেন, 'তোমাকে নিতে এসেছে তবে তো আমাকেও নিতে আসবে।' আমি জানালার পাশ থেকে বললাম, 'নিতে আসবে না আব্বা, এসে গেছে অনেক আগে।' আব্বা উঠে দরজা খুললেন। ততক্ষণে বাড়ির সবাই জেগে আছে। রাসেল খুবই ছোট্ট। শুধু ও ঘুমিয়ে আছে। দোতলায় চায়ের ঘরে গিয়ে ইলেক্টিক কেটলিতে চায়ের পানি চাপালাম। চোখের

পানি বাঁধ মানে না। মাও চোখের পানি চেপে রাখার চেষ্টা করছেন আর আব্বার কাপড়-চোপড় গুছিয়ে দিলেন, অনেকগুলি এরিনমোর তামাকের কৌটা দিলেন—পরে পাঠাতে অসুবিধা হয় বলে, লেখার জন্য কাগজ, কলম, খাতা সাথে নেন। কিছু বইপত্র এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী মা সব ঘুছিয়ে দিলেন। আব্বাকে ওরা নিয়ে গেল। ছোট্ট রাসেল অবুঝ অঘোরে ঘুমুচ্ছে। কিছুই বুঝবে না, জানবে না। সকাল হয়ে গেল। পড়াশোনা আর হল না, মনে হল বাড়িটা বড় শূন্য, ফাঁকা। এতদিনের কর্মচাঞ্চল্য হঠাৎ করে যেন থেমে গেল। সারাটা দিন কারও খাওয়া-দাওয়া হল না। আত্মীয়-স্বজন যারা খবর পেল, দেখা করতে এল, আবার এতদিন যাদের দেখেছি অনেক চেনামুখ আর দেখা গেল না। তবু সুখ-দুঃখের সাথী যারা তারা ঠিকই দেখা করল। একে একে আওয়ামী লীগের বহু নেতা-কর্মীকে ওরা গ্রেফতার করল।

১৯৬১ সালে এই বাড়িটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। কোনো মতে তিনটা কামরা করে এসে আমরা উঠি। এরপর মা একটা একটা কামরা বাড়াতে থাকেন। এভাবে ১৯৬৬ সালের শুরুর দিকে দোতলা শেষ হয়। আমরা দোতলায় উঠে যাই। ছয় দফা দেবার পর কাজকর্মও বেড়ে যায়। নিচতলাটা তখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেই ব্যতিব্যস্ত। নিচে আব্বার শোবার কামরাটা লাইব্রেরি করা হয়। ড্রেসিং রুমে স্যাইকোলোস্টাইল মেশিন পাতা হয়। লাইব্রেরির কামরায় টাইপরাইটার মেশিন। আব্বা আলফা ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি নেন বন্দিখানা থেকে মুক্তি পাবার পর। তখন রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। আওয়ামী লীগের সব নেতা 'এবডো' ছিলেন, অর্থাৎ সক্রিয় রাজনীতিতে কেউ অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। তাই ছাত্রদের সংগঠিত করে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন শুরু করা হয়। আব্বা অবশ্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি বেড়াতে যেতেন বিভিন্ন জেলায়। সেখানে দলকে সংগঠিত করার কাজ ও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য প্রতি জেলা, মহকুমা, থানায় গোপন সেল গঠন করেন। দেশকে স্বাধীন করার জন্য দলকে সুসংগঠিত করার কাজ গোপনে চলতে থাকে। ছাত্র

আন্দোলন গড়ে ওঠেছে। ১৯৬২-তে বহু ছাত্র গ্রেফতার হয়। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের বহু নেতৃবৃন্দ এ বাড়িতে এসেছে গোপনে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ নিতে ও আলোচনা করতে। এখন অনেকের অবস্থানই ভিন্ন ভিন্ন প্লাটফর্মে বলে আমি কারও নাম নিতে চাই না।

১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি আব্বাকে ঢাকা জেলখানা থেকে বন্দি করে নিয়ে যায়। ১৮ই জানুয়ারি আমরা জেলগেটে গিয়ে আব্বার দেখা পাই না, কোথায় নিয়ে গেছে— বেঁচে আছেন কিনা তাও জানি না। ছোট্ট রাসেল, অবুঝ রাসেল কিছুই বোঝে না। আব্বা আব্বা করে কেবল কাঁদে। জেল গেট থেকে ফিরে এসে এই বাড়ির মেঝেতে গড়িয়ে আমরা অনেক কেঁদেছি। এরপর শুরু হল মিথ্যা মামলা, তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, আব্বাকে ফাঁসি দেবার ষড়যন্ত্র। গর্জে উঠল বাংলার মানুষ। শুরু হল আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি জনগণের চাপে আব্বাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হল। সেদিন এই বাড়ির সামনে মানুষের ঢল নেমেছিল। সমস্ত বাড়িই যেমন জনতার দখলে চলে যায়, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন মিছিলের পর মিছিল আসতে থাকে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এসে আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে যেত। আব্বা কখনও গেটের পাশে চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে, কখনও বাড়ির বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতেন। আমরা আব্বার পাশে এসে দাঁড়াতাম, হাজার হাজার মানুষের ঢল নামত তখন এই বাড়ির সামনে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ। গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা হয়েছিল এই বাড়িটি। রাত ১২.৩০ মিনিটে আব্বা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার নির্দেশ দিলেন। আর সেই খবর ওয়ারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রাম পৌঁছে দেওয়া হল পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী। এই খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের নেতারা তা প্রচার শুরু করলেন। এই খবর পাকিস্তানি সেনাদের হাতে পৌঁছল। তারা আক্রমণ করল এই বাড়িটিকে। রাত ১.৩০ মিনিটে তারা আব্বাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। আজও মনে

পড়ে সে স্মৃতি। লাইব্রেরি ঘরের দক্ষিণের যে দরজা তারই পাশে টেলিফোন সেটটি ছিল ঐ জায়গায় দাঁড়িয়েই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিয়েছেন। যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

২৬শে মার্চ পুনরায় এই বাড়ি হানাদার বাহিনী আক্রমণ করে। মা, রাসেল, জামাল ও কামাল কোনোমতে দেয়াল টপকিয়ে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাড়িতে ঢুকে লুটতরাজ শুরু করে। প্রতিটি ঘর তারা লুট করে, ভাংচুর করে, বাথরুমের বেসিন কমোড আয়না সব ভেঙে ফেলে। কয়েকজন সেনা বাড়িতে থেকে যায়—দীর্ঘ নয় মাস ধরে এই বাড়ি লুট হতে থাকে। পাক সেনারা এক গ্রুপ লুট করে যাবার পর আর এক গ্রুপ আসত। সোনাদানা জিনিসপত্র সবই নিয়েছে। আমরা এক কাপড়ে সব বেরিয়ে গিয়েছিলাম। আমার আর মার যে গহনা লকারে ছিল সেগুলি বেঁচে যায় কিন্তু চাবি হারিয়ে যায়।

ছয় দফা দেবার পর অনেক সোনা-রূপার নৌকা, ৬ দফার প্রতীক প্রায় ২-৩ শত ভরি সোনা ছিল। এগুলি আমার ঘরের স্টিলের আলমিরায় রাখা ছিল। সব লুট করে নিয়ে যায়। যাক, ওসবের জন্য আফসোস নেই, আফসোস হল বই। আব্বার কিছু বইপত্র, বহু পুরোনা বই ছিল। বিশেষ করে জেলখানায় বই দিলে সেগুলি সেন্সর করে সিল মেরে দিত। ১৯৪৯ থেকে আব্বা যতবার জেলে গেছেন কয়েকখানা নির্দিষ্ট বই ছিল যা সব সময় আব্বার সঙ্গে থাকত। জেলখানার বই বেশির ভাগই জেল লাইব্রেরিতে দান করে দিতেন কিন্তু আমার মার অনুরোধে এই বই কয়টা আব্বা কখনও দিতেন না, সঙ্গে নিয়ে আসতেন। তার মধ্যে রবীন্দ্র রচনাবলি, শরৎচন্দ্র, নজরুলের রচনা, বার্নাড শ' কয়েকটা বইতে সেন্সর করার সিল দেওয়া ছিল। জেলে কিছু পাঠালে সেন্সর করা হয়, অনুসন্ধান করা হয়, তারপর পাস হয়ে গেলে সিল মারা হয়। পরপর আব্বা কতবার জেলে গেলেন তার সিল এই বইগুলিতে ছিল। মা এই কয়টা বই খুব যত্ন করে রাখতেন। আব্বা জেল থেকে ছাড়া পেলেই খোঁজ নিতেন বইগুলি এনেছেন কিনা। যদিও

অনেক বই জেলে পাঠানো হত। মা প্রচুর বই কিনতেন আর জেলে পাঠাতেন। নিউ মার্কেটে মার সঙ্গে আমরাও যেতাম। বই পছন্দ করতাম, নিজেরাও কিনতাম। সব সময়ই বই কেনা ও পড়ার একটা রেওয়াজ আমাদের বাসায় ছিল। প্রচুর বই ছিল সেই বইগুলি ওরা নষ্ট করে। বইয়ের প্রতি ওদের আক্রোশও কম না। আমার খুবই কষ্ট হয় ঐ বইগুলির জন্য। ঐতিহাসিক দলিল হয়ে ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে তা সবই হারালাম।

১৯৮১ সালে আমি ফিরে এসে বাড়িটি খুলে দিতে বলি, কিন্তু জেনারেল জিয়াউর রহমান অনুমতি দেয়নি। এমনকি বাড়িতে প্রবেশ করার অনুমতিও পাইনি। মিলাদ পড়ানোর জন্য বাড়ির দরজা জিয়া খুলে দেয়নি। রাস্তার উপর বসেই আমরা মিলাদ পড়ি। জেনালের জিয়া সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে থাকার জন্য বাড়ি দেবার প্রস্তাব পাঠান। আমি একজন স্বৈরাচারের হাত থেকে কিছু নিতে অস্বীকার করি। আমাদের দেশে প্রচলিত নিয়ম আছে প্রয়াত রাষ্ট্রপতির পরিবারকে একটি বাড়ি, একটি ফোন, ভাতা, গাড়ি ইত্যাদি কিছু সুযোগ সুবিধা রাষ্ট্র দিয়ে থাকে (যেমন—জেঃ এরশাদ সরকারের কাছ থেকে তার স্ত্রী ও পরিবার গ্রহণ করতেন)। আমরা কোনোদিনই কোনো কিছু গ্রহণ করিনি। জেনানেল জিয়া নিহত হবার পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার এই বাড়ির দরজা খুলে দেন। দেশে যখন আবার মার্শাল ল' জারি হয় এই বাড়িটি বিরোধী দলের জন্য নিরাপদ আশ্রয় ছিল। যদিও দোতলা বা সিঁড়ি আমরা ব্যবহার করিনি কখনও, কেবলমাত্র বসার ঘর আর লাইব্রেরি ঘরটা ব্যবহার করেছি, মিটিং করেছি। অনেক জরুরি পরিস্থিতিতে বহু মিটিং হয়েছে এখানে। ১৯৮৩ সালের ২১শে জানুয়ারি আমি এই বাড়ির চত্বরে দাঁড়িয়ে মার্শাল ল'র প্রকাশ্য বিরোধিতা করি। ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারের এই বাড়িটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনার নীরব সাক্ষী। জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কর্মসূচি প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণসহ বহু ঘটনা এই বাড়িতে ঘটেছে।

আবার ১৯৯০ সালের ২৭শে নভেম্বর গ্রেফতার করে আমাকে এই বাড়িতে আনা হয়। ৬ই ডিসেম্বর এরশাদের পতন পর্যন্ত এই বাড়িতে

গৃহবন্দি হিসেবে অবস্থান করে আমরা রাজনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাই। ১৯৯১ সালে নির্বাচনের সকল কাজ এই বাড়িতে বসেই করি।

এই বাড়িটি যখন ১২ই জুন, ১৯৮১ সালে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার সাহেবের নির্দেশে খুলে দেওয়া হল তখন বাড়িটির গাছপালা বেড়ে জঙ্গল হয়ে আছে। মাকড়সার জাল, ঝুল, ধুলোবালি, পোকামাকড়ে ভরা। ঘরগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন। গুলির আঘাতে লাইব্রেরি ঘরের দরজা ভাঙা, বইয়ের আলমারিতে গুলি, কাঁচ ভাঙা, বইগুলি বুলেটবিদ্ধ, কয়েকটা বইয়ের ভিতরে এখনও বুলেট রয়েছে। একটা বই, নাম 'শ্রদ্ধাঞ্জলি'। বইটির উপরে কবি নজরুলের ছবি। বইটির ভিতরে একখানা আলগা ছবি, একজন মুক্তিযোদ্ধার— বুলেটের আঘাতে বইটি ক্ষতিবিক্ষত। মুক্তিযোদ্ধার ছবিটির বুকের উপর গুলি। ঠিক ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সালে এ বাড়িতে যে আক্রমণ হয় তা হল ১৯৭১ সালের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ। এ বইটির দিকে তাকালে যেন সব পরিষ্কার হয়ে যায়। কেন ওরা হত্যা করল বঙ্গবন্ধুকে? মনে হল যেন পরাজয়ের প্রতিশোধ নিল। মায়ের ঘরের আলমারির সব জিনিস বিছানার উপর স্তূপ করা। ঘরের মেঝেতে বড় বড় গুলির আঘাত। দোতলায় মার শোবার ঘর। এই ঘরেই খুকী রোজী জামাল রাসেলকে গুলি করেছে। মা দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন, মাকে ওখানে গুলি করেছে। আব্বার বিছানার পাশে টেবিলটায় রক্তের ছোপ এখনও শুকিয়ে আছে। পূর্ব দিকের দেয়াল জুড়ে রক্তের দাগ। ছাদের উপর মাথার ঘিলু গোছা গোছা চুলসহ লেগে আছে। এই ঘরেই হত্যাকারীরা ঐ নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। তারপর দুহাতে ঘর লুটপাট করেছে। দোতলার সিঁড়িতে এখনও রক্তের দাগ রয়েছে। দোতলায় জামালের ঘরের বাথরুমের বড় আয়নাটায় গুলির আঘাতে বড় একটা গর্ত হয়ে আছে। আয়নাটা ভেঙেছে, দোতলার বসার ঘরের পশ্চিম পাশের ঘরটা প্যান্ট্রি ঘরের মত, ওখানে ইস্ত্রি করার টেবিল। পাশে ডিনার ওয়াগান, কাচের ও রূপার জিনিসপত্র ভরা, উত্তরদিকে একটা সেলফ যেখানে মায়ের হাতের আচারের বৈয়ামগুলি। এখনও সেই আচারের ঘ্রাণ রয়েছে। একটা টিনে কিছু আতপ চাল ছিল, সাত বছর পরও চাল তেমনই

আছে। মিটসেপে সব জিনিসপত্র। পাশে একটা আলমারির ভিতরে তোয়ালে ও বিছানার চাদর থাকত, ঠিক সেভাবেই আছে। শুধু ঘরের মধ্যে মাটিতে স্তূপীকৃত কাপড় আর তুলা। তুলা ও কাপড়চোপড়ে রক্তে ছোপ ছোপ দাগ রয়েছে। এই ঘরে কেন এত রক্তমাখা কাপড়? জানি না সেদিন কি ঘটেছিল? ঐ খুনিরাই বলতে পারে যাদের এতটুকু হাত কাঁপেনি এভাবে গুলি চালাতে। মার বিছানা ও বালিশ গুলিতে ঝাঁঝরা। জামালের ঘরের বিছানা ও বালিশ গুলির আঘাতে আঘাতে ফুটো হয়ে আছে। অনেক দুর্লভ ছবি, জরুরি কাগজপত্র, দলিল, ব্যাংকের চেক বই সব খুনিরা নিয়ে গেছে। ছবিগুলি নষ্ট করেছে, ছিঁড়েছে, পরবর্তী সময়ে পোকায় কেটেছে।

১৯৮৭ সালে জেনালের এরশাদ আমাকে এই বাড়িতে গৃহবন্দি করে রেখেছিল। সমস্ত বাড়ির জিনিসপত্র ১২ বছরে একদম নষ্ট হয়ে যায়। কারণ খুনিরা শুধুমাত্র হত্যাকাণ্ডই করে ক্ষান্ত হয়নি, তারা হত্যার পর লুটপাটও করেছে। এই লুটপাট কয়েকদিন ধরে চলেছে। মা, রেহানা ও জামালের ঘরেই লুটপাটের চিহ্ন। মার ঘরের আলমারির সমস্ত কাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র বিছানার ওপর ছড়ানো। তোষক-বালিশগুলি একদিকে বুলেটে ঝাঁঝরা আবার অনেকগুলি বালিশ ছেঁড়া। দীর্ঘদিনের অযত্নের ফলে মাকড়সার জাল, পোকা ও ধুলায় সব নষ্ট হয়ে গেছে। আব্বা ও মার ঘরের পাশে ড্রেসিংরুমে আলমারিতে যেসব কাপড় ছিল তার সব দলা করে রাখা ও পোকায় খাওয়া। মনে হয় যেন আলমারি খুব ঘাঁটাঘাঁটি করেছে? কেন? অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র এমনিক শাড়িগুলি পর্যন্ত খুনিরা নিয়ে গেছে। মেঝে ভর্তি পুরু ময়লা, পোকামাকড়, আরশোলা। সমস্ত ঘর ও আলমিরাতে উইপোকা। সব কিছুর উপর দিয়ে কি যে ঝড় বয়ে গেছে তা ভাষায় বর্ণনা করে বোঝাবার শক্তি আমার নাই।

এই ঘরবাড়ির সর্বত্র আমার মায়ের হাতের ছোঁয়া। কিন্তু দস্যু-দানবদের হাতে সব আজ এলোমেলো হয়ে ছড়ানো ছিটানো। সর্বত্র মনে হয় নারকীয় পিশাচের হিংস্র উল্লাস ও লুণ্ঠনের স্পর্শ। এই বাড়িতেই আমি বন্দি। ধুলায় জমে যতই দিন যাচ্ছে ততই নষ্ট হচ্ছে।

বাড়িটাকে একদিন মিউজিয়াম করব, তার আগে পরিষ্কার করা দরকার। মনকে শক্ত করা অত্যন্ত কঠিন। জিনিসপত্রগুলিতে হাত দেয়া কি যে বেদনাদায়ক তা লিখে বোঝানো যাবে না। শুধু যারা এভাবে সব হারিয়েছেন তারাই হয়তো বুঝতে পারবেন।

আমার মা অত্যন্ত পরিপাটি গোছানো স্বভাবের ছিলেন। প্রতিটি জিনিস অত্যন্ত সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখতেন যাতে প্রয়োজনে সবকিছু হাতের কাছে পাওয়া যায়। শীতের কাপড় এক আলমারিতে গোছানো, গরমের কাপড় অন্য আলমারিতে। তেমনি আটপৌরে কাপড়, স্যান্ডেল, জুতা পর্যন্ত সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতেন। মা যখন আলমারি খুলতেন দারুণ কৌতূহল হত সব কিছু দেখার। অনেক সময় আমিও আলমারি খুলতাম, তবে মা যা বের করতে বলতেন তাছাড়া অন্য কিছুতে হাত দিতাম না। তবে মা খুললেই হাত দিতে খুব ইচ্ছা হত, কিন্তু সব আবার গুছিয়ে রাখতে পারব না বলে হাত দেয়া হত না। আমার মায়ের হাতের সেই সুন্দর গোছানো সবকিছু আজ দানব-খুনিদের হাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। মনকে মানিয়ে একসময় বালতি ভর্তি পানি, সাবান, কাপড় ঝাড়ু নিয়ে সব ঘর পরিষ্কার করতে শুরু করলাম। এত ময়লা যে একটা ঘর পরিষ্কার করতে দিনে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা কাজ করেও পাঁচ-ছয় দিন লেগেছে। নিজের হাতে সব পরিষ্কার করে আমার মা যেভাবে যে জিনিস যেখানে রাখতেন ঠিক সেখানে রাখতে চেষ্টা করেছি। দুহাতে ময়লা সাফ করেছি আর চোখের পানি ফেলেছি। শুধু মনে হয়েছে এই জন্যই কি বেঁচে ছিলাম। কি দুর্ভাগ্য আমার। সবই চলে গেল। আমি হতভাগিনী শুধু চোখের জলে ভাসছি আর এই বেদনা-যন্ত্রণা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে কষ্টে দম বন্ধ হয়ে যেত। কাজ বন্ধ রেখে অনেকক্ষণ আকুল হয়ে কেঁদে নিতাম, আবার একসময় মনকে শক্ত করতাম। একটা জিনিসও অক্ষত রেখে যায়নি। যা পেয়েছে লুট করেছে, যা রেখে গেছে ক্ষতবিক্ষত করে রেখে গেছে। ফোটোগুলো ছিঁড়েছে, কাগজপত্র ডায়েরি দলিলপত্র সব নষ্ট করেছে। যে ঘরে যত ধুলা ময়লা ছিল কিছুই ফেলিনি। বড় বড় পলিথিনের ব্যাগে ভরে

রেখেছি। কেন যেন ফেলতে পারলাম না। মনে হয় যেন সব ছিল, সবাই ছিল, এইমাত্র বাইরে গেছে, আবার আসবে, আবার আসবে।

সব ঘরই আমি পূর্বের মতো করে সাজাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আম্মা যেটা যেভাবে যেখানে রাখতেন ঐ ভাঙাচোরা সব আবার সেইভাবে রাখতে চেষ্টা করেছি,আমার মায়ের মতো করে। যখনই কোনো জিনিসে হাত দিয়েছি, বিশেষ করে মায়ের আলমিরা খুলে গোছাতে গেছি— মনে হয়েছে, এইমাত্র মা বুঝি পাশে এসে দাঁড়াবেন, বকবেন 'ঘাঁটাঘাঁটি করিস নে, গোছান জিনিস নষ্ট হবে' বলে সাবধান করবেন, পরমুহূর্তে মনে হয়েছে মা তো আমার নেই! সব আছে, এই ঘর, এই বাড়ি— মনে হয় মার নিঃশ্বাস যেন শুনতে পাই, পাশ থেকে তাঁর মমতার স্পর্শ যেন অনুভব করি।

অনেক স্মৃতিভরা ৩২নং সড়কের এই বাড়িটি। বাড়িটি আমাদের থাকবে না। ওটা এখন জনগণের সম্পত্তি। ট্রাস্ট করে জনগণের জন্য দান করে দিয়েছি। আমার আব্বা শুধু তো আমাদের ছিলেন না, তার থেকেও বেশি ছিলেন—জনগণের। আমরা সন্তান হিসেবে তাঁকে যতটুকু পেয়েছি এদেশের জনগণ তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছে। জনগণের কল্যাণে অধিকার আদায়ের আন্দোলনে জেলে কাটিয়েছেন জীবনের অধিকাংশ সময়। আমরা আর কতটুকু তাঁকে কাছে পেয়েছি! তাই এই বাড়িটি এত স্মৃতিভরা, এ ভার বইবার ক্ষমতা আমার নেই, রেহানারও নেই। তাই আজ আমরা আনন্দিত এ বাড়িটি জনগণকে দান করে দিতে পেরে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর করার পরিকল্পনা ছিল আমাদের দীর্ঘদিনের। আমরা আজ গৌরববোধ করতে পারি আমাদের বহু স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়িটি আজ বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির প্রিয় তীর্থস্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

১০ আগস্ট, ১৯৯৪

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তার শুরু হয়েছিল ১৯৭৫ সালে ১৫ই আগস্টের পর থেকে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে অশুভ শক্তি সংবিধান লঙ্ঘন করে ক্ষমতা দখল শুরু করে। প্রথমে ক্ষমতা দখল, পরে ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার কলাকৌশল ও সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে। রাজনীতির স্বাভাবিক ধারাকে ব্যাহত করেছে। ক্ষমতা কে দখল করবে, কিভাবে করবে এবং জোর যার মুল্লুক তার এটাই হয়েছে মূল উৎস। জনগণের অস্তিত্ব এখানে বিলুপ্ত।

জনগণের এখন কিছুই করবার নেই।

শুধু শোনা ও দেখা আর হায় হায় করা। আমাদের সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—"প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।"

জনগণ খাজনা দেয়, ট্যাক্স দেয়। তাদের ট্যাক্সের পয়সায় রাষ্ট্র চলে, সরকার চলে, বৈদেশিক ঋণের বোঝা পরিশোধ করা হয় অথচ সেই জনগণের কোনো মতামত দেবার ক্ষমতা নেই। জনগণ এখানে উপেক্ষিত। জনগণের যে মতামত আছে, মতামতের গুরুত্ব আছে সে কথা জনগণকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আমাদের দেশে এক সময় জমিদার প্রথা ছিল। জমিদাররা প্রজাদের কাছ থেকে জোর করে খাজনা আদায় করত। খাজনা আদায় করতে গিয়ে প্রজাদের উপর অত্যাচার করত। ফসল হোক না হোক জমিদারের খাজনা পরিশোধ করতেই হবে। না দিলে ভিটে-মাটি, থালা-বাসন, গরু-ছাগল সবই কেড়ে নেওয়া হত। এমনিভাবে বহু পরিবার নিঃস্ব হয়ে দরিদ্র হত।

জমিদাররা অত্যাচার করে যে ধন-সম্পদ আহরণ করত তা তারা ইংরেজ সরকারকে খাজনা পরিশোধ করত। বাকি টাকা-পয়সা বিলাস-ব্যসনে ব্যয় করত।

জমিদারদের অত্যাচারের ফলে যারা নিঃস্ব দরিদ্র হত তাদেরই আবার টাকা দান করে জমিদাররা দানশীল হত। খেতাব পেত—উদারতা ও দানশীলতার গুণগান হত।

জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু প্রক্রিয়াটা মনে হয় এখনও রয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রেই তা দেখা যায়।

ধরা যাক রাজনীতির ক্ষেত্রে। মার্শাল ল'র মাধ্যমে অসাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অর্থ-সম্পদ আহরণ করে,অর্থাৎ সোজা কথায় বলা যেতে পারে আখের গুছিয়ে, জুত হয়ে বসে প্রথমে। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে ক্ষমতা দখল করে দল গঠন ও নির্বাচনের নামে প্রহসন এবং ভোট কারচুপি করে ক্ষমতার বৈধকরণ করার পর নিজেদের উদারতা দেখাবার সুযোগ খোঁজে 'গণতন্ত্র দিয়েছি' 'বহুদলীয় গণতন্ত্র দিয়েছি' 'গণতান্ত্রিক সরকার' ইত্যাদি বিশেষণে নিজেদের ভূষিত করে। প্রথমে যে সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে তা ভুলেই যায়। প্রচার এমনভাবে করে যেন সব দিয়ে জনগণকে কৃতার্থ করছে।

মার্শাল ল' সংবিধান লঙ্ঘনকারী আইন। জনগণের মৌলিক অধিকার, মানবিক অধিকার কেড়ে নেয় মার্শাল ল'। দ্বিতীয় প্রক্রিয়া দেখি, মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখবেন বাসের গায়ে লেখা—মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুদান এবং মহামান্য প্রধানমন্ত্রীর অনুদান....।

স্কুল কলেজ পরিদর্শন-অর্থ অনুদান ঘোষণা, হাট ঘাট বাজার সবকিছু শুধু দান আর দান.... ।

প্রশ্ন থাকে, এই যে দান অনুদান করে কৃতার্থ করছেন এ টাকা-পয়সা কার?

এ টাকার মালিক তো জনগণ, জনগণের ট্যাক্স ও খাজনার পয়সায়-ই তো জনগণকে এই অনুদান দেওয়া হচ্ছে। যাদের টাকা তাদেরকে অনুদান হিসেবে দিয়ে নাম লিখিয়ে ছাত্র সমাজ বা শিক্ষক ও অভিভাবক এবং সাধারণ মানুষ মূলত তাদেরই দেওয়া ট্যাক্স ও খাজনার টাকায় দান-অনুদান পেয়ে বাহবা দিচ্ছে সরকারকে। এটা কি সেই এক হাতে নিয়ে অন্য হাতে দিয়ে অত্যাচারী জমিদারদের মতোই আচরণ করা হচ্ছে না? অথচ আমাদের দেশের মানুষ এ বিষয়ে সচেতন নয়।

আমাদের দেশে উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে লিপিবদ্ধ হয় যেসব স্কুল সেসব জায়গা সরকার প্রধান অথবা রাষ্ট্রপ্রধান পরিদর্শন করবেন। তার জন্য প্রচুর অর্থ খরচ করে অভ্যর্থনার আয়োজন করবে। তিনি গিয়ে অমুক কলেজে এত লক্ষ বা কোটি অনুদান, একখানা বাস দান ইত্যাদি ইত্যাদি ঘোষণা দেবেন। 'বাহ বাহ বেশ বেশ, বড়ই দানশীল' বলে সুনাম কুড়াবে।

ভালোই, এক হাতে কেড়ে নেবে অন্য হাতে দান করে সুনাম ও সম্মান কুড়াবে।

সবকিছুতেই একটা পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। যেকোন জায়গায় স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বা যেকোনো এলাকার উন্নয়নের জন্য আশু ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চালাবার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়। বাজেট সেজন্যই প্রণয়ন করা হয়। সরকার পরিবর্তন হবে কিন্তু মূল পরিকল্পনার পরিবর্তন হবে না।

হয়তো বা উন্নয়নের জন্য সংশোধন হতে পারে, সংযোজন হতে পারে। পরিকল্পনাহীন রাষ্ট্রপরিচালনা দেশকে উন্নয়নের ধারায় ফেলতে পারে না।

আমাদের দেশে ৮৬ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। শিক্ষিতের হার মাত্র ৩০ ভাগ। দরিদ্র অশিক্ষিত মানুষগুলিকে শোষণ করা সহজ। মিথ্যা কথা বলে ভুলানো সহজ। অন্যের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে বিভ্রান্ত করা সহজ। ভোটের আগে টাকা দিয়ে কেনা সহজ। আমাদের দেশে এই সহজ সরল মানুষগুলিকে সেইভাবে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে দিনের পর দিন।

পৃথিবী আধুনিক প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে গেছে কিন্তু আমরা কেবলই পিছিয়ে যাচ্ছি। সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। সকল জনগণকে সম্পৃক্ত করবার প্রক্রিয়া দরকার। আর সেই কারণে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় জনগণের অংশীদারিত্ব থাকাও একান্ত প্রয়োজন। তাতে জনগণের দায়দায়িত্বও থাকে, দায়িত্ববোধ থেকে কর্তব্যবোধও জাগ্রত হয়।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে গত ১৯ বছর জনগণ চরমভাবে উপেক্ষিত। কেবল তোষামোদি, খোষামোদি ও চাটুকারিতাই প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে কর্তব্য ও দায়দায়িত্ব সম্পর্কে মানুষ সচেতন হয় নাই। শুধু শুনেছে কিভাবে 'ম্যানেজ' করতে হবে। বরমাল্য দিয়ে তুষ্ট করতে হবে, তারপর প্রাপ্য আদায় হবে। মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপতি যিনিই ক্ষমতায় তিনিই এই চাটুকারিতারই গুরুত্ব দিয়েছেন — এটা করেছে অসৎ রাজনীতির ভিত তৈরি করবার জন্য।

জনগণেরই টাকা, তাদের ট্যাক্স ও খাজনার টাকা আবার তাদেরকেই দান করে প্রমাণ করবার চেষ্টা যে "উন্নয়নের জন্য এত দান করলাম, কাজেই তোমরা আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকো বা হুকুম মেনে চলো।"

আমি জানি না আমাদের দেশের মানুষ কবে সচেতন হবে, আর এদের মুখের উপর জবাব দেবে, 'আমাদেরই ঘাম ও রক্তের টাকা তোমাদের কাছে জমা দিয়েছে তোমরা সেখান থেকেই খরচ করছ। তোমাদের পৈতৃক সম্পত্তি বা রক্ত ও ঘামের কামাই আমাদের দিচ্ছ না।' — জনগণ বলবে কি সে কথা?

এই যে শোষণ আর বঞ্চনার শিকার, এর হাত থেকে পরিত্রাণ কোথায়? ভান করে যাচ্ছে। আন্তরিকতা কোথায়? ভালোবাসা উৎকণ্ঠা কোথায়? সহানুভূতি নেই কেন? দেশপ্রেম. মানুষের প্রতি কর্তব্যবোধ নেই কেন? মানুষকে ধোঁকা দিয়ে শুধুমাত্র ক্ষমতার মসনদটা ধরে রাখা আর অর্থ সম্পদের মালিক হওয়াই কি বড় কথা? দেশ ও জাতির স্বার্থে এতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে কেন দেখি না?

দেশ ও জাতির জন্য ত্যাগী, দেশপ্রেমিক মানুষের বড় প্রয়োজন। ক্ষমতা অর্থ-সম্পদের মালিক হবার জন্য নয়, জনগণের জন্য কাজ করা, জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করা, জনগণের সার্বিক উন্নতির জন্য কাজ করা— এই চিন্তা চেতনা নিয়ে ক্ষমতায় না গেলে দেশ ও দশের কোনো উন্নতি হবে না। গত ১৯ বছরে হয় নাই। ৮৬ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমায় বাস করে। এ লজ্জা আমরা রাখব কোথায়?

মানুষের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে পারলেই বুঝি আবার দ্বার অবারিত হতে পারে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যিনি কর্ণধার হবেন তাঁর মানসিকতা চলন-বলন আচরণ সমাজের উপর দারুণ প্রভাব ফেলে। আর তাই ক্ষমতায় যখন কোনো অবৈধ দখলকারী থাকে অথবা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় গিয়েও আচরণ যখন ঐ অবৈধ দখলকারীদের মতো হয় তখন জনগণ আর ভরসা করতে পারে না। তাদের ভরসার স্থানটাই হারিয়ে যায়। আর এর প্রভাব জনজীবনের সর্বস্তরে পড়ে।

হতাশা থেকে আসে হিংসা, দ্বেষ, জিঘাংসা।

সমাজকে এই অশুভ জায়গা থেকে বাঁচাতে হলে শুরু করতে হবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূল থেকে। মানুষের মনের উপর যার প্রভাব পড়বে সেখান থেকে। এমন একটা ব্যবস্থাপনা নিয়ে আসতে হবে যাতে মানুষ তার ভরসার জায়গাটা খুঁজে পায়, আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। সন্দেহ, হিংসা, দ্বেষ মানুষের চরিত্রে যে স্খলন করেছে তার থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে হবে।

আজ যখন আমরা জনগণের ভোটের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করছি তখন বার বার আব্বার কথা মনে পড়ছে। যখন তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি দিলেন। অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের ঐক্যের ডাক দিলেন এবং সকল রাজনীতিবিদ, বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষকে একই মঞ্চে সমবেত করে দেশগড়ার কাজে আত্মনিয়োগের ব্যবস্থা করলেন। তখন একটা নতুন সিস্টেম দাঁড়াল। আমি আব্বাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'সারাজীবন সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন, এখন এই পদ্ধতিতে কেন গেলেন?'

তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, একটা বিপ্লব হয়েছে। যেকোনো বিপ্লবের পর সমাজে একটা বিবর্তন আসে, আমাদের সমাজেও আসবে। দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন হবে এবং এর বিস্তৃতিও হবে— যার প্রভাব পড়বে সমাজ ব্যবস্থার উপর। কিছু মানুষ হঠাৎ করে প্রচুর টাকার মালিক হবে— সামাজিক অবস্থান ও প্রভাব বাড়াতে নির্বাচন করবে শুধু টাকার জোরে; এর প্রভাব নির্বাচনের উপরও পড়বে। দেখা যাবে টাকা ও লাঠির জোরে নির্বাচন হচ্ছে। সত্যিকার সমাজসেবক ও দেশপ্রেমিক বা আদর্শবান যারা তারা এদের সাথে টাকা ও লাঠির জোরে পেরে উঠবে না। তাই এমন একটা ব্যবস্থা করতে চাই অন্তত কিছু দিনের জন্য যাতে কালো টাকা ও পেশিশক্তি নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে না পারে। একটা সাধারণ নির্বাচন যদি এভাবে হয় তাহলেই মানুষের চক্ষু খুলে যাবে আর মানুষকে কেউ ধোঁকা দিতে পারবে না। আর এ ব্যবস্থা মাত্র ৩/৪ বৎসরের জন্য; পরে আবার আমরা সংসদীয় গণতন্ত্রে ফিরে যাব।'

ভোটারদের ভোটের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার জন্য এটা করা।

এই নতুন পদ্ধতিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল এমন যে, যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তাদের প্রচার পোস্টার ইত্যাদি সব রাষ্ট্র চালাবে। ব্যক্তিগত গণসংযোগ স্থাপন এবং জনগণের আস্থা অর্জন যে

প্রার্থী করতে পারবে সে-ই জিততে পারবে। অস্ত্র আর অর্থ নির্বাচনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না। এই নতুন পদ্ধতিতে কয়েকটি উপনির্বাচন হয়। কিশোরগঞ্জের এক উপনির্বাচনে একজন স্কুল মাস্টার জয়লাভ করেন। উপ রাষ্ট্রপতির ভাই এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল কিন্তু একজন স্কুল মাস্টারের কাছে পরাজিত হয়। ক্ষমতা ও অন্য কোনো প্রভাব নির্বাচনে ফেলতে পারেনি।

এই পদ্ধতি কার্যকর করবার সময় বঙ্গবন্ধু পাননি। তার পূর্বেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তিনি শহিদ হন। এরপর থেকে শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া শুরু। এই প্রক্রিয়া পাকিস্তানি আমলে আইয়ুব খান চালায়। কনভেনশন মুসলিম লীগ করে মার্শাল ল'র মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে। জেঃ জিয়াউর রহমান সংবিধান লঙ্ঘনকারী। বে-আইনিভাবে তিনি ক্ষমতা দখল করেছিলেন—নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন পরবর্তীতে দল গঠন, নির্বাচন নামের প্রহসন করে। রাজনীতিতে নেতা কেনাবেচা, ভোটার কেনাবেচার যে প্রক্রিয়া তিনি শুরু করেছেন তাতেই সংকট আরও ঘনীভূত হয়। তিনি বলেছিলেন, "I will make politics difficult।" ঘটনাটি সত্যিই তিনি ঘটিয়েছিলেন। রাজনীতিবিদদের জন্য সত্যিই রাজনীতি সংকটময় করে তুলেছেন।

তার দল গঠনের প্রক্রিয়া এবং দখলিকৃত ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার অশুভ তৎপরতায় সেনাবাহিনীর বহু সদস্য, অফিসার ও জোয়ান নিহত হয়েছেন। তিনি ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেছেন। বহু রাজনীতিবিদকে হত্যা করেছেন। সাংবাদিক, শ্রমিকনেতাসহ অনেককে হত্যা করেছেন। কেবল সেনাবাহিনীতে ১৮টার উপর ক্যু হয়েছে। অবিশ্বাস, সন্দেহ, নৈরাজ্য সমাজকে গ্রাস করেছে। তিনি মানুষের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করেছেন।

যেভাবে জিয়াউর রহমান বিএনপি দল গঠন করে মার্শাল ল'র দ্বারা ক্ষমতা দখল করেন, একই কায়দায় জেনারেল এরশাদ জাতীয় পার্টি তৈরি করেন। এই নতুন দল করে অবৈধ ক্ষমতা দখলের জন্যই

নির্বাচনের কারচুপি শুরু করা হয়। সংবিধান লঙ্ঘন করে দখলকৃত ক্ষমতাকে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বৈধকরণের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ ভোট প্রয়োজন। ভোট কারচুপি ছাড়া কোনোমতেই পর্যাপ্ত সিট পাওয়া সম্ভব নয়। এরই বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করলাম এবং ১৯৯০ সালে ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থান হল। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করলাম কিন্তু যে দল ক্ষমতায় এল সে দলটি একজন অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীর হাতে গড়া; কাজেই স্বভাব তাদের একটুও পরিবর্তন হয় নাই। তাই ক্ষমতায় গিয়ে বিভিন্ন উপনির্বাচনে কারচুপির আশ্রয় নিতে শুরু করল।

যে আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তা ধুলায় লুণ্ঠিত হল। ভোটারদের হত্যা করা, ভোটার পরিবারকে লাঞ্ছিত করা, রাষ্ট্রদ্রোহী দলকে অর্থ দিয়ে ভাড়া করা কারচুপির সহযোগিতার জন্য ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়াই আজ ধ্বংস। মাস্তান দিয়ে কেন্দ্র দখল, সিল মারা আবার শুরু হল।

ঢাকার মেয়র নির্বাচনের পর লালবাগে ছয়জন ভোটারকে গুলি করে হত্যা করা হলো। ওদের অপরাধ ছিল ওরা বিএনপিকে ভোট দেয় নাই। এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আজও অব্যাহত রয়েছে। গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা হারিয়ে গেছে।

জনগণ আজ চরমভাবে উপেক্ষিত। মাগুরা উপ-নির্বাচনের কারচুপি অত্যন্ত জঘন্য প্রক্রিয়ায় করা হয়েছে। ভোটারদের ইচ্ছার কোনো মূল্য ছিল না।

বিএনপি সরকারের কারচুপির প্রয়োজন কেন? কারণ আর কিছুই না। এক নম্বর হল, এদের স্বভাব। জন্ম থেকেই দলটি কারচুপি করা ছাড়া সুস্থ গণতান্ত্রিক ধারার চিন্তা করে নাই।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র পরিচালনায় চরম অযোগ্যতা অদক্ষতা সিদ্ধান্তহীনতা। সবকিছু অচল হয়ে আছে।

তৃতীয়ত, বিএনপি বুঝতে পেরেছে কারচুপি ছাড়া তাদের কোনো গতি নাই, কারণ তারা ইতোমধ্যে ব্যাপক হারে দুর্নীতি করেছে, কালো

টাকার মালিক হয়েছে। ক্ষমতায় না থাকতে পারলে এই দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীদের শাস্তি হবে— দুর্নীতি করবার সুযোগ সৃষ্টি করবার জন্য প্রশাসনকে ব্যাপক হারে দলীয়করণ করেছে। ফলাফল হল আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বেড়েছে। প্রশাসন অচল। প্রমোশন নিয়ে হাইকোর্টের রিট, সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে। কোনো বিষয়েই এই সরকার সময়মতো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সবকিছুতে বিলম্ব করা এই সরকারের চরিত্র।

শুধু মুখে গণতান্ত্রিক সরকার বলে দাবি করলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না। পরমতসহিষ্ণুতা, সমঝোতা করবার মানসিকতা না থাকলে গণতন্ত্র চর্চা করা যায় না। বর্তমান সরকারের মধ্যে এ জাতীয় কোনো লক্ষণ দেখা যায় না।

বিশেষ করে নির্বাচনে বিরোধীদলকে ভোট দেবার অপরাধে ভোটারদের হত্যা করেছে বিএনপি সরকার। রীতিমত গণহত্যা। কাজেই ভোটারদের জীবনের নিরাপত্তা আর নাই। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকারটুকু পর্যন্ত এই সরকার কেড়ে নিয়েছে।

রাষ্ট্র চালনার ক্ষেত্রে অযোগ্যতা, ভোটারদের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাবার কারণেই আজ প্রশ্ন উঠেছে দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া সম্ভব কিনা। ২৫শে জানুয়ারি চারটি জায়গায় উপনির্বাচন হয়ে গেল। এই উপনির্বাচনে ভোটকেন্দ্রগুলিতে ভোটারদের কোনো উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। তারপর দেখা গেল ফলাফল বেরিয়েছে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোট পড়েছে। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে—এই ভোট দিল কে? এটা কি ভুতুড়ে ভোট? না কি প্রহসন? একজন নিহত ও বহু আহত। বিএনপি সরকার কি জবাব দেবে? জনগণ ট্যাক্স দেয় ভোটের অধিকার, মৌলিক অধিকারের জন্য। সেই অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কতদিন চলবে? সরকারের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা না থাকলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। 'জোর যার মুল্লুক তার' সভ্য দুনিয়ায় মধ্যযুগীয় এই বর্বরতা কি বর্তমানেও চলতে থাকবে?

পৌরসভা নির্বাচনগুলিতে বিএনপি সরকার ভোট পায় নাই। এলাকা দখল করে ভোট ডাকাতি করেছে বরিশাল পৌরসভায়, সিলেটে, শিবগঞ্জে ও চাঁদপুরে। সব জায়গায় অবশ্য সুবিধা করতে পারে নাই কিন্তু ভিন্ন কৌশল গ্রহণ করছে। চুরি করেও যখন জিততে পারে নাই তখন নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে কিভাবে ফলাফল পাল্টানো যায় সেই ব্যবস্থা করতে চেষ্টা চালাচ্ছে। কারণ প্রধানমন্ত্রীর হুকুম। 'জনগণ ভোট দিক আর না দিক জিততেই হবে'—যদি মনোভাব এটাই থাকে তাহলে ভোটচুরি, সন্ত্রাস, কালো টাকা, প্রশাসনকে ব্যবহার করে নির্বাচনের ফলাফল পরিবর্তন চলতেই থাকবে।

সেখানেই আমাদের দাবির যৌক্তিকতা হচ্ছে—কোনো সরকার যদি জানে যে নির্বাচনের সময় তাকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হতে তাহলে সেই সরকার নির্বাচনের পূর্বে যে সমস্ত ওয়াদা করবে তা পালন করবে। আর ওয়াদাও যা ইচ্ছা তা করবে না, যতদূর করতে পারবে ততটুকুই করবে। মানুষকে অযথা বিভ্রান্ত করতে না, সরকার পরিচালনায় দুর্নীতি ও কালো টাকা কামাই করবার প্রবণতাও কমতে বাধ্য হবে, কারণ ক্ষমতা যখন ছাড়তে হবেই তখন দুর্নীতির দায়ে ধরা পড়বার সম্ভাবনাও থাকবে। কাজেই সরকার সচেতন হবে, সমাজ থেকে দুর্নীতির ব্যাধি কিছুটা হলেও লোপ পেতে শুরু করবে।

ভোটারদের জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকবে। ক্ষমতাসীনদের ভয়ে অনেক সময় ভোটাররা ভোটকেন্দ্রেই যেতে সাহস পায় না। তাছাড়া ভোটারদের পরিবারদের উপরও অকথ্য নির্যাতন চলে। নির্যাতনের শিকার হয় বাড়ির মহিলারা, যা ঘটেছে মাগুরা উপনির্বাচনে। মানুষের আহাজারি–আর যেন ভোট না আসে, ভোট আসলেই অত্যাচার। এ মানসিকতা সুস্থ গণতান্ত্রিক চর্চার পরিপন্থি। গণতন্ত্র বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সে পরিবেশ যাতে না হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। দলীয় সরকার না থাকলে মাস্তানদের দৌরাত্ম্য কমবে।

বিরোধী দলকে ভোট দিলে ভোটারদের হত্যা করা এবং হত্যাকারীরা ধরা না পড়ে বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়ায়। এতে জনমতে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। এ ব্যবস্থারও পরিবর্তন করতে হবে। আইনকে আপনগতিতে চলতে দিতে হবে। নির্দলীয় সরকার থাকলে খুনিরা প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যাকাণ্ড চালাতে পারবে না। ১৯৯১ সালের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা এ আস্থা অর্জন করেছি। অন্তত মানুষের জীবনের নিরাপত্তাবোধ জাগ্রত করতে হবে।

যে দীর্ঘ উনিশটি বছর নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যে অনিয়ম চলছে সে অনিয়ম দূর করে একটা সুস্থ ধারা নিয়ে আসা একান্ত অপরিহার্য। এদেশে কোনো সমস্যার সমাধান হবে না যদি না ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট হয়।

আর সে কারণেই অন্তত আগামী কয়েকটি নির্বাচন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করবার একটা ব্যবস্থা নিলে এই অনিয়মগুলি দূর করা যেতে পারে।

ক্ষমতাসীনরা ভোটার লিস্ট পর্যন্ত মনমতো করেছে। ঘরে ঘরে গেলেই বোঝা যায় যে কে কোন দলের ভোটার। কাজেই সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ভোটার লিস্টে বহু নাম রয়েছে যাদের কোনো অস্তিত্বই নেই, আবার অনেক ভোটার রয়েছে যাদের নামও নেই। জাল ভোট দিতে যাতে সুবিধা হয় তার জন্য এই ব্যবস্থা।

১৯৯৩ সালের সেনসাস রিপোর্ট বের হয়েছে। তারপরই নতুন ভোটার লিস্ট করা উচিত ছিল। বর্তমান ভোটার লিস্ট নিয়ে এক সময় বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও অভিযোগ তুলেছিলেন, কিন্তু কোন রহস্যময় কারণে ক্ষমতায় গিয়ে আর তার কোনো পরিবর্তন বা সংশোধন করা হল না?

প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিজেও বলেছিলেন ভোটার লিস্ট ত্রুটিপূর্ণ, অথচ সেই ভোটার লিস্ট ত্রুটিমুক্ত করবার কোনো ব্যবস্থাই তিনি গ্রহণ করেননি। কারণ ঐ লিস্ট ছিল মূলত আওয়ামী লীগকে ঠেকানোর জন্য। প্রধান নির্বাচন কমিশনার রউফ সাহেব এ ব্যাপারে

কেন ব্যবস্থা নেননি। তাঁর পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ কি কখনও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় সহায়ক হবে?

দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও কালো টাকার উৎসগুলিকে টিকিয়ে রাখার জন্যই নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ত্রুটিমুক্ত করা হচ্ছে না। এ ব্যাধি এ সমাজকে কুরে খাচ্ছে।

এর থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য জনগণ আগ্রহী। আমাদের প্রচেষ্টা জনগণকে সহযোগিতা করা যাতে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন জনগণকে ফিরিয়ে দিতে পারি।

আর সে কারণেই আমরা আগামী তিনটি নির্বাচন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে চেয়েছি, যাতে করে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যে সমস্ত ত্রুটি রয়েছে ধীরে ধীরে তা সংস্কার ও ত্রুটিমুক্ত নির্বাচনী ব্যবস্থায় নিয়ে আসতে পারি।

২৮ জানুয়ারি, ১৯৯৫